উড়ো চিঠি

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য দেড় টাকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
আর্য্যপাবলিশিং হাউস
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা,

১ম সংস্করণ
মাঘ ১৩২৯

৭২ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,
মেটকাফ্ প্রেস।

বন্ধুবর—

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

সু—করকমলেষু।

উড়ো চিঠি

—•※•—

অক্টোবর ১৫,

অমর,

তোমার শেষ চিঠি পরশু পেয়েছি—আগের চিঠিগুলোও ঠিক ঠিক পেয়েছি।

জান কি এখানে আমার অবস্থাটা কেমন ছিল? ঠিক আমাদের দেবতাদের মতো—ভোগ গ্রহণে তাঁরা সদাই উন্মুখ, আর কামাদানে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। তেম্‌নি আমার চিঠি পাওয়ার কোন বাধা ছিল না—কিন্তু চিঠি লেখায় নিষেধ ছিল। তাই তোমায় এতদিন চিঠি লিখিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে তুমি আমাকে নিয়ম-মতো চিঠি লিখে এসেছ তাতেই প্রমাণ হয় যে তোমার অতি উচ্চ অবস্থা—একেবারে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" অবস্থা—একেবারে "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়" অবস্থা। সবে কাল তোমায় চিঠি লিখ্‌বার অনুমতি পেয়েছি—তাই তোমায় এই চিঠি লিখ্‌ছি।

* * * * *

তুমি আমায় যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থার খবর দিয়েছ। সে খবর আমি সংবাদপত্রের পাতায় পেয়েছি—সংবাদপত্র আমার নিষিদ্ধ

নয়। ঐ অজুহাতে তুমি যে-রকম হা হুতাশ করেছ তা তোমার মতো মানুষের পক্ষে নিতান্ত অশোভন। ছাব্বিশ বছর বয়সে যদি তোমার মুখে হা হুতাশ ফোটে, তবে তিরিশ বছরের সময় তোমার বুকে নির্ব্বাণ বাসা বাঁধবে নিশ্চয়—তাতে তোমার কোন লাভ নেই, অথচ সংসারের ঘোর ক্ষতি আছে। আমাদের শাস্ত্রেই আছে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে বনেই যাবে— নির্ব্বাসনেও নয়, শ্মশানেও নয়। কথাটা একবার ভেবে দেখ্‌বে।

তুমি আশা করেছ যে এই কুরুক্ষেত্রের পর জগৎ থেকে যুদ্ধ উঠে যাবে। জগৎ সম্বন্ধে তুমি এমন pessimistic হ'লে কবে থেকে? আমি কিন্তু এ আশঙ্কা কোন দিনও করিনে যে এমন এক সময় আস্‌বে, যখন পৃথিবীর সব মানুষগুলোই এক সময়ে বস্‌বে, এক সময়ে উঠ্‌বে, এক কারণে হাস্‌বে, এক ধরণে কাঁদ্‌বে, এক রকমে হাঁট্‌বে, একই ভাবনা ভাব্‌বে, একই কামনা কর্‌বে। এত বড় দুর্ঘটনা আমি পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন দিনও ভাব্‌তে পারিনে। যদি রামকে দেখ্‌লেই শ্যামকে বোঝা যায়, যদি ভরত মুনিকে দেখ্‌লেই ভারত মুন্‌সীকে চেনা যায়, তবে এ জগৎটা কি রকম uninteresting কি রকম dull হয়ে ওঠে বল দেখি? অথচ যুদ্ধ উঠে যাবার সম্ভাবনা হবার আগে পৃথিবীর অবস্থা ঠিক ঐ রকমই হওয়া চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা কোন দিন হবে না। যদি তা হয় তবে মানুষগুলো তার মন বুদ্ধি চোখ কান হাত পা দিয়ে কি কর্‌বে শুনি? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কি

স্বপ্ন দেখ্‌বেন ? নৃতত্ত্ববিদেরা কোন্ সূত্র ধর্‌বেন? ঐতিহাসিকেরা কি জল্পনা কর্‌বেন ? কবিরাই বা কি কল্পনা কর্‌বেন'? পৃথিবীটা তখন হবে একটা প্রকাণ্ড ইউক্লিডের জ্যামিতি—তার পিছনে মস্ত একটা Q. E. D.—যা কেটে কেউ কোন দিন Q. E. F. কর্‌তে পার্‌বে না। আর আমি একটা ভবিষ্যৎবাণী কর্‌তে পারি। পৃথিবীর যদি ওরকম অবস্থা বাস্তবিকই কোনদিন আসে, তবে দেখ্‌বে জগৎব্যাপী একটা সমিতির জন্ম হবে যার নাম হবে "নির্ব্বাণ-সমিতি"। তার হেড্ কোয়ার্টার হবে হয় ফিলাডেল্‌ফিয়া নয় স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো—আর তার সভ্য হবে অন্তত পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক—আর এই অর্দ্ধেক লোকই হবে আসল বুদ্ধিমান।

কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমার সে আশঙ্কা নেই। এবং রাম শ্যাম হরি কোন দিনই যুক্তি করে' চিন্তা কর্‌বে না। এবং দশম শতাব্দী চিরকালই চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে ভিন্ন হ'য়ে প্রত্নতত্ত্ববিদের রত্নরাজি জুগিয়ে চল্‌বে। এবঞ্চ রাজা গণেশ চিরকালই গণেশ শা থেকে পৃথক্ হয়ে ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ববিদের কলমের খোঁচা খাবে।

আসলে পৃথিবীটা সৌরজগৎ নয়—যেখানে গ্রহ উপগ্রহ-গুলো অনন্ত আকাশে বন্ বন্ করে' ঘুরেও কারো গায় কেউ লাগ্‌ছে না। এ পৃথিবীটা অতি ছোট। পৃথিবীতে ক' কোটী লোক ?. আমার মনে হচ্ছে না। জিওগ্রাফি দেখে নেবে। জান, জিওগ্রাফি সাথে নিয়ে কেউ চিঠি লিখ্‌তে বসে না। যা

হোক্‌ অতকোটী লোকের দেহের জন্যে পৃথিবীটা যথেষ্ট হলেও, অতকোটী লোঁকের মনের জন্যে তা যথেষ্ট নয়। মানুষের দেহটা সাড়ে তিন হাত লম্বা—তার মনটার দৈর্ঘ্য-বিস্তারের খবর P. W. D.র কোন ওভারসিয়ার দিতে পারেন না, কোন ঐতিহাসিকও দিতে অক্ষম—এমন কি কোন কবিও দিতে সক্ষম নন। অথচ অতকোটী মনের প্রায় সব কটাই এ মাটী ছেড়ে আকাশে উঠ্‌তে পারে না, বা উঠ্‌তে চায় না। কাজেই এমন ঠেসাঠেসি হয় যে মনে মনে ঘর্ষণ না হয়ে যায় না। আর এই ঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাতে কখনও বা টল্‌কে ওঠে দোয়াতের মসি, আর কখনও বা ঝল্‌কে ওঠে কোষের অসি।

কিন্তু এমন কি কোন দিন শুনেছ যে কবিতে কবিতে যুদ্ধ হয়েছে বা দার্শনিকে দার্শনিকে লড়াই চলেছে? শোন নি। তার কারণ তাদের মন আকাশে ওঠে। অনন্ত আকাশ—দেদার জায়গা—accommodationএর অভাব নেই। সেই জন্যে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হবার কোন সম্ভাবনাও নেই।

আবার অন্য দিকে দেখ। প্রকৃতিদত্ত যুদ্ধসজ্জা হিংস্র জন্তুর যেমন, মানুষের তেমন নয়। তাদের ধারাল দাঁত, ধারাল নখ, গায়ে অমানুষিক শক্তি, যা মানুষের নেই। অথচ এ কথা কি শুনেছ যে একদিকে পঞ্চাশ হাজার সিংহ আর একদিকে পঞ্চাশ হাজার সিংহ দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে? কিম্বা এ গল্প কি শুনেছ যে সুন্দরবনের Royal Tigerএর দল ছোটনাগপুরের কেঁদো বাঘদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে? তা কোন দিন করেনি

তার কারণ তাদের মন নেই। থাক্‌লেও তা তাদের দেহের চাইতে ছোট, সুতরাং তা তাদের দেহের মধ্যেই এমন আরামে থাকে যে পরস্পরের মনের সঙ্গে কোন সংঘর্ষই হয় না। তাই যুদ্ধও হয় না।

তুমি হয় ত বল্‌বে যে যারা যুদ্ধ করে না বা যাদের যুদ্ধ কর্‌তে হয় না তাদের পক্ষে বাড়ীতে বসে' বসে' ইজিচেয়ার থেকে পা দুলিয়ে দুলিয়ে দিব্যি চা-চুরুটের সঙ্গে যুদ্ধের psychological ব্যাখ্যা করা খুব আরামের সন্দেহ নেই, এবং তা দার্শনিকতার পরিচায়কও হতে পারে; কিন্তু যাদের রক্তে মাটী সিক্ত হয়ে উঠেছে তাদের কাছে যুদ্ধটা কি রকম লাগে তার খবর যদি নিতে, তবে এ রকম নির্ব্বিঘ্নে ওরকম কথাগুলো বল্‌তে পার্‌তে না। তোমার কথা ঠিক। ইংরেজ আস্‌বার পর থেকে অস্ত্র নিয়ে আমাদের সকল কার্‌বার উঠে গেছে— তাই আমাদের সকল কার্‌বার এখন শাস্ত্র নিয়ে। কিন্তু ঐ যে যুদ্ধ আমাদের কর্‌তে হয় না তাতে আমরা সবাই বুদ্ধ হয়ে উঠিনি। আসলে যুদ্ধ করার দায় থেকে আমরা বেঁচেছি বলে' আমরা কেউই খুসি নই—তুমি congress resolution ইত্যাদি সংবাদ পত্রে নিয়ম মতো পড়ে' থাক, তা তোমাকে বিশেষ করে' বলাই বাহুল্য। অস্ত্রহীন হয়ে আমরা তুষ্ট নই, বরং রুষ্ট।

এইখানে তোমাকে একটা কথা বলে' রাখ্‌ছি। আমার কথা শুনে তুমি মনে কোরো না যে আমি জার্ম্মানীর যে কোন Herr Vonএর মতোই একজন প্রচণ্ড "মিলিটারিষ্ট"—মোটেও

নয়। আমি শুধু যা দেখ্‌ছি তারি একটা চৌহদ্দি তোমায় ধরিয়ে দিচ্ছি।

বল্‌তে পার জগতে কোন্ যুগে যুদ্ধ হয় নি? এটা না হয় মান্‌লুম ঘোর কলি,—ধর্ম্মের ত্রিপাদ গিয়েছে, এক পাদ যাব-যাব। কিন্তু দ্বাপরে যখন ধর্ম্মের দ্বিপাদ ছিল তখন কি আজকের চাইতে যুদ্ধ কম হয়েছে? আবার ত্রেতাতে যখন ধর্ম্মের ত্রিপাদ ছিল, তখন কি দ্বাপরের তুলনায় যুদ্ধের কিছু কম ছিল? আমাদের হিন্দুদের ত কথাই নেই। আমাদের নৃসিংহও অবতার, আবার বুদ্ধও অবতার। বাস্তবিক, হিন্দুদের মতো চিন্তাজগতে এমন daring, এমন "কুছ পরোয়া নেহি" ভাব জগতের আর কোন জাতের নেই। আসলে প্রত্যেক যুগে যুদ্ধ যা হবার তা হয়ে এসেছে—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মন্ত্র তা ঠেকাতে পারে নি। আমার কি মনে হয় জান? "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মন্ত্র যেমন জগতে যুদ্ধ কমাতে পারে নি, তেমনি আজ যদি জগতে কোন মহাপুরুষ প্রচার করেন "হিংসাই পরম শ্রেয়" তাহলেই যে জগতে যুদ্ধের অনুপাতটা বেড়ে যাবে তাও আমি বিশ্বাস করিনে। যুদ্ধটি হচ্ছে ঠিক বাৎসরিক "মন্‌সুনের" মতো—গড়ে বৃষ্টির অনুপাত ঠিকই থাকে। তবে অনৈসর্গিক কারণে একটু উনিশ বিশ হয় মাত্র। আসল ব্যাপারটা কি জান? মানুষের রক্তে সংগ্রামের বীজ রয়েছে। সেই বীজই কখনও বা স্বার্থের বাতাসে আর কখনও বা পরার্থের আলোকে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে। তাই কখনও সমাজে যুদ্ধ করি ধর্ম্মের নামে, আর

কথনও করি অর্থের জন্য। ঐ ধর্ম্মই বল আর অর্থই বল, ওসব হচ্ছে নিমিত্ত মাত্র। আসল কারণ হচ্ছে মানুষের রক্তের ঐ সংগ্রামের বীজ। চীনাদের মতো আফিং খাইয়ে যদি বিশ্ব-মানবের রক্তের ঐ সংগ্রামের বীজকে নষ্ট করে' ফেল্‌তে পার তবেই পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠে যাবে। যদি বল যে আফিং কেন? তার উত্তর হচ্ছে—বিষেই বিষক্ষয় হয়। সংগ্রামের বীজকে ত তুমি বিষ বলে' মানই—আর আফিং ও যে বিষ তা হতভাগা মেয়েদের আত্মহত্যার রিপোর্ট দেখে যাচিয়ে নিতে পার।

সভ্যজগতের খেলাগুলোর প্রতি নজর দিয়ে দেখেছ কি? খেলা—নির্দ্দোষ আমোদ, যা নাকি মানুষের অন্তরের নিছক আনন্দ থেকে গড়ে উঠছে, সেই খেলাগুলোর সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? টেনিস্‌ ফুট্‌বল ব্যাডমিন্‌টন ক্রিকেট হকিই বল, আর, তাস পাশা দাবা ক্যারমই বল, বা Wrestling Boxingই বল, সব তাতেই চাই দুটো দল—আর খেলার পরিণাম ফল হচ্ছে হার জিত। কেন? কারণ মানুষের রক্তে ঐ সংগ্রামের বীজ আছে বলে'। তা যদি না হত, তবে দেখ্‌তে মানুষের খেলাগুলো অন্য আকারে গড়ে' উঠ্‌ত। আমাদের দেশের মেয়েদের খেলা জান ত? রাঁধা-বাড়া, বিয়ে-বিয়ে। সেই কচুপাতার লুচি, খোলামকুচির পয়সা, কাদার দই, ইঁটের সন্দেশ, বালির চিনি।—ঠিক সেই মডেলে পুরুষদের খেলাও গড়ে' উঠ্‌ত যাতে দলাদলিও নেই, হার-জিতও নেই, আছে একটানা শান্তির

হিল্লোল— আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত করুণরসাত্মক ও মিলনান্ত।

মানুষের রক্তে যে সংগ্রামের বীজ আছে এ থিওরি আমি আরও উড়িয়ে দিতে পারি নে যখন মনে করি—এমন যে আমাদের দেশেও নৈয়ায়িক পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত তর্কযুদ্ধ কর্‌তেন। জান ত সেই— "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র"। তুমি হয়ত বল্‌বে যে শাস্ত্রযুদ্ধ আর শস্ত্রযুদ্ধ এক নয়। তা না বটে। কিন্তু ও দুয়ের পিছনে কোন্ সত্যটা, কোন্ principleটা কাজ কর্‌ছে? রক্তের ঐ সংগ্রামের বীজ নয় কি? আর তাঁরা ঐ তর্ক কর্‌তে কর্‌তে যে-রকম মুক্তকচ্ছ উচ্চশিখ হতেন, তাতে প্রমাণ হয় না যে তাঁরা তর্কযুদ্ধের জের টেনে অস্ত্রযুদ্ধে এনে না ফেল্‌তেন। কারণ অস্ত্রযুদ্ধটা আসলে তর্কযুদ্ধেরই জের—তার logical conclusion। তর্কযুদ্ধ ততক্ষণই চল্‌তে পারে যতক্ষণ কাণ্ডজ্ঞান খাড়া থাকে; তর্ক কর্‌তে কর্‌তে যখন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় অথচ কোন মীমাংসা হয় না তখন বাধে অস্ত্রযুদ্ধ। আর তর্ক কর্‌তে কর্‌তে যে বাস্তবিকই কাণ্ডজ্ঞান লোপ হয় তার উদাহরণ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠা খুঁজ্‌লে অনেক পাবে। তবে ভাটপাড়ার তর্কসভায় সে রকম যে কোনদিন ঘটে নি তার কারণ—সেখানে কেউই অস্ত্র নিয়ে তর্কসভায় যেতেন না। তা যদি যেতেন তবে দেখ্‌তে সেখানে পাত্রাধার তৈলাধার চলে' গিয়ে তলোয়ারের ধারের পরীক্ষা চল্‌ত।

আসলে কিন্তু যুদ্ধটাকে তুমি যত খারাপ বলে' মনে কর

আমি তত করি নে। তুমি বল্‌ছ—যুদ্ধটা বিশ্বমানবের একটা ব্যাধি। আমি বল্‌ছি—ওটা ব্যাধি নয়, ওটা হচ্ছে ব্যাধির ওষুধ। মানুষের গায়ে ফোড়া উঠ্‌লে তাতে সে প্রথমে প্রলেপ লাগায়, তাতে যদি ফোড়া না ফাটে তবে তখন অস্ত্র কর্‌তে হয়। সেই রকম বিশ্বমানবের মনে বা কোন জাতি বা সমাজবিশেষের মনের গায় মাঝে মাঝে ঐ রকম ফোড়া উঠে। সে ফোড়া যদি মসীর প্রলেপে না ফাটে তবে সেখানে বাধ্য হয়ে অসি বসাতে হয়—আর সেটা নিষ্ঠুরতা নয়—সেটাই হচ্ছে পরিণাম-মঙ্গল সহানুভূতি। তবে এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের একটা ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে দেখা যায়। সাধারণ জীবনে এর চিকিৎসকই রোগীর দেহে অস্ত্র করে' থাকেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে দু'জন রোগী বিকারের ঘোরে পরস্পরের মনের গায়ে অস্ত্র কর্‌ছে। ফলে হয় পরিণামে দু'জনেই মরে, নয় দু'জনেই আরাম লাভ করে, পরস্পর পরস্পরকে বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করে—দু'জনের অন্তরে প্রেমের ঢেউ উথ্‌লে ওঠে। আর তাতে জগতের লাভ।

তুমি হয়ত এখানে প্রশ্ন কর্‌বে, এই যে এত বড় একটা যুদ্ধ ইয়োরোপে চল্‌ছে এতে জগতের কি লাভ হবে, কি মঙ্গল হবে? এর উত্তরে আমি তোমাকে অনেকগুলো মিথ্যে কথা ও মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিতে পার্‌তুম। আয়ারল্যাণ্ড হোমরুল পাব পাব হয়েছে,—জগতের মাঝে ভারতবাসীর স্থানটা মাউণ্ট্‌ এভারেষ্টের সমান উঁচু হয়ে উঠ্‌বার মতো হয়েছে—ইত্যাদি রকমের অনেক

অনেক "প্রিয়মনৃতং" তোমায় শুনিয়ে দিতে পার্‌তুম। কিন্তু তুমি জান চিরকালই conscience ব'লে একটা জিনিস আমার আছে। তাই সে-সব তোমায় বল্‌ব না। তবে এ যুদ্ধে জগতের কি লাভ হ'ল তা তোমাকে বল্‌ছি—অর্থাৎ আমি যে রকম বুঝি।

আগে তোমাকে একটু ইতিহাস শোনাব। বৈজ্ঞানিক না, পৌরাণিক না, সন তারিখের না,—যুগযুগান্তের।

জান আমাদের শাস্ত্রে আছে চারটে যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি। এর মধ্যে আমরা ত্রেতা দ্বাপর কলি এই তিন যুগেরই পরিচয় কিছু কিছু জানি। ত্রেতা হচ্ছে রামায়ণের যুগ, দ্বাপর হচ্ছে মহাভারতের যুগ, আর কলি হচ্ছে আমাদের যুগ। কিন্তু সত্য যুগের কোন সংবাদ আমরা পাইনে। কিন্তু সত্য যুগ সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমি করে' নিয়েছি, সেটা তোমায় বল্‌ছি।

সত্যযুগ সম্বন্ধে যে আমরা কোন খবর পাইনে তার কারণ হচ্ছে এই যে আসলে ওটা হচ্ছে মানুষের অসভ্য যুগ। তখন মানুষ ছিল একবারে ঘোর অসভ্য—প্রায় ইতর প্রাণীদেরই মতো। আর তাদের জীবন চালিত হত ইতর প্রাণীদের মতোই প্রকৃতি দিয়ে নির্ভুলভাবে। তাই তাদের জীবনে কোনখান দিয়ে কোন অনৃত প্রবেশ কর্‌তে পেত না। তাদের কোন দুঃখ ছিল না। একটা পাখী বা বেড়ালের জীবনের সঙ্গে আজকার একটা মানুষের জীবন তুলনা করে' দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার। তাদের জীবন ছিল সত্যময়—তাই তাদের

কোন পাপ ছিল না। কারণ মিথ্যাই পাপ, মিথ্যাই দুঃখ। আর সেইটে ছিল সত্যযুগ।

বাইবেলের ঐ যে পৌরাণিক গল্প যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে মানুষের পাপ-জ্ঞান হ'ল—এ কথাটা বেজায় সত্যি। ঐ যে ঈডেন উদ্যানে অ্যাডাম আর ঈভ্ ক থাকৃত—উলঙ্গ, ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কোন জ্ঞান ছিল না—খালি প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হ'ত—সেই হচ্ছে সত্যযুগ। তারপর তারা যেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে অম্‌নি তাদের পাপের জ্ঞান হ'ল। মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে তখন মন গড়ে' উঠ্‌ল। মন গড়ে' উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চিন্তা কর্‌তে শিখ্‌ল; চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে তারা আপনার মধ্যে যে পুরুষ আছে তার সন্ধান পেল; পুরুষের সন্ধান পেয়ে তারা সেই পুরুষের যে ইচ্ছাশক্তি বলে' একটা সম্পদ আছে তার অনুভব পেল;—তখন মানুষ মনে মনে বল্‌ল—তাই ত রে, আমরা ত ঠিক তেমন কল নই, আমরাও ত আমাদের ইচ্ছা অনুসারে একটা কিছু কর্‌তে পারি। তখন তারা প্রকৃতিকে ডেকে বল্‌ল—প্রকৃতি, আমরা আর তোমার ঘড়ির কাঁটা ধরে' চল্‌ছি নে। প্রকৃতি বল্‌লে—তোমরা ইচ্ছা-শক্তির সন্ধান পেয়েছ কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি খোলে নি, তোমরা পদে পদে ভুল কর্‌বে—পদে পদে তোমরা মিথ্যাকে সত্য বলে' মান্‌বে। তাতে তোমাদের জীবনে দুঃখ আস্‌বে। মানুষ বল্‌লে—সে দায় আমাদের। তোমার আর mother-in-lawর মতো উপদেশ দিতে হবে না।

সে দিন থেকে মানুষের চিন্তা মানুষের will কখনও তাকে সত্য-পথে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল কখনও তাকে মিথ্যা-পথে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। আর এই সত্যই হ'চ্ছে ধর্ম্ম বা পুণ্য আর ঐ মিথ্যাই হ'চ্ছে অধর্ম্ম বা পাপ।

মানুষ তার willএর খবর পেয়ে কি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল জান? তার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে লাগ্‌ল। শিশু যেমন হাতে খেলনা পেয়ে কখনও সেটাকে গালে পুরে' দেয়, কখনও সেটাকে দু'হাত দিয়ে চাপ্‌ড়ায়, আবার কখনও মাটিতে ফেলে দলে—মানুষ তার জীবনটা নিয়ে ঠিক তেম্‌নি কর্‌তে লাগ্‌ল। এম্‌নি কর্‌তে কর্‌তে যতই দিন যেতে লাগ্‌ল মানুষ দেখ্‌তে পেলে তার ভিতরটাতে কি এক বিরাট ব্যাপার—কি এক অন্তহীন রহস্য। তার মনে পর্‌দার নীচে পর্‌দা, আবার তার নীচে পর্‌দা, আবার তার নীচে পর্‌দা; তার হৃদয়ে রঙের পর রঙ্‌, আবার তার উপরে রঙ্‌, আবার তার উপরে রঙ্‌; তার চিত্তে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কত চিত্র-বিচিত্র ছবি স্তরে স্তরে সাজান। তার জীবনটাকে সে কত ভঙ্গীতেই সাজালে, কত রঙ্গেই নাচালে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিয়ে ছড়িয়ে কত রকমেই দাঁড় করালে!—দেখ্‌লে সে জীবনের সীমা নেই, শ্রান্তি নেই, বিরক্তি নেই, ঔদাসীন্য নেই। মানুষ মনে ভাব্‌লে—প্রকৃতির কথা শুনে ভুল কর্‌বার ভয়ে, মিথ্যা হয়ে উঠ্‌বার ভয়ে, সেইখানেই থেমে থাক্‌লে ত হয়েছিল আর কি! মানুষের এমন রহস্য ত চিরকাল গুপ্তই থেকে যেত!

এম্‌নি করে মানুষের জীবনে experimentএর পর experiment পরীক্ষার পর পরীক্ষা চল্‌তে লাগল। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে যা ঘটে' থাকে—কখনও jar ভাঙে, টিউব ফাটে, গ্যাস বেরিয়ে নাকে চোখে ঢোকে, অ্যাসিড লেগে হাতে ফোস্কা পড়ে—মানুষের জীবনেও তেম্‌নি ঘট্‌তে লাগল। মানুষের কখনো হাত ভাঙ্‌ল, পা ভাঙ্‌ল, মাথা ফাট্‌ল, অহঙ্কারের বিষাক্ত গ্যাস নাকে চোখে ঢুকে ধরাটাকে সরার মতো ছোট বলে প্রতীয়মান হ'ল—কিন্তু সে কিছুতেই পিছু-পা নয়—তবুও সে ঐ আদিম অসভ্য অবস্থার শান্তিময় সত্যময় জীবনে ফিরে যেতে রাজি নয়। কারণ নিছক মানুষ মনে প্রাণে দেহে যতই দুঃখ যতই কষ্ট অনুভব করুক না কেন, তার অন্তর-দেবতা, তার পরমাত্মা, তার "গভীরতম আমি" সর্ব্বদাই জান্‌ছে যে এ খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন এ কথা মনে করা illogical হবে না যে জীবনের এম্‌নি experiment চল্‌তে চল্‌তে মানুষ একদিন তার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ কর্‌বে—সেদিন তার দৃষ্টি খুল্‌বে। সেদিন সে ঐ পূর্ণজ্ঞান নিয়ে তার জীবনটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বে যাতে তার জীবনে কোন মিথ্যা কোন অনৃত কোন অধর্ম্ম প্রবেশ করতে পার্‌বে না। সেই হবে আর-এক সত্যযুগ। তবে এ সত্যযুগ সেই আদিম অসভ্য সত্যযুগ থেকে বিভিন্ন হবে। কারণ সে সত্যযুগ হচ্ছে প্রকৃতি-পরিচালিত, আর এ সত্যযুগ হবে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত। একটা হচ্ছে instinctive, আর একটা হচ্ছে

born of knowledge; একটা হচ্ছে অজ্ঞানের, আর একটা হচ্ছে বিজ্ঞানের; একটাতে মানুষ আপনাকে মোটেই পায় নি, আর একটাতে মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণ করে' পেয়েছে; একটাতে মানুষ পশু, আর একটাতে মানুষ ঈশ্বর; একটাতে আছে মানুষের negative শক্তি ও সোয়াস্তি, আর একটায় তার positive আনন্দ।

কিন্তু ঐ অবস্থায় উঠে যে অনন্তকাল মানুষ ঐখানে থাক্‌বে তাও নয়। ঐ অবস্থায় এসে যখন মানুষ পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ আনন্দ নিয়ে থাক্‌বে, তখন তার মনের নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'তে থাক্‌বে, তখন তার জীবনটা হবে অতি সুনিয়ন্ত্রিত—শুদ্ধম্ সত্যম্। ও-রকম অবস্থায় মানুষের মনে ধীরে ধীরে তামসিকতা ঢুক্‌বে। শতাব্দী শতাব্দী কাটিয়ে একদিন সে জেগে উঠে দেখ্‌বে যে তারা আনন্দ হারিয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেখ্‌বে যেটাকে তারা আনন্দ বলে' মনে করেছে সেটা হচ্ছে আসলে আরাম। সেদিন মানুষ আবার নতুন করে' আবিষ্কার কর্‌বে যে তাদের ভিতরের সঙ্গে বাহিরের কোন মিল নেই। বাহিরটা হয়ে উঠেছে শাস্ত্র আর ভিতরটা হ'য়ে উঠেছে কল। বাহিরের দেয়াল আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরের মানুষ সেখানে কবে ঘুমিয়ে গেছে। সেদিন আবার এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, আমরা যাকে বলি অবতার। তিনি চারিদিকে ধ্বংসের মন্ত্র প্রচার কর্‌বেন—ভাঙ ভাঙ ঐ মিথ্যার প্রাচীর, যার ভিতরে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আনন্দ

নেই, সতেজ প্রাণ নেই, সরাগ মন নেই,—আছে শুধু শাস্ত্রের শ্লোক আর দুর্ব্বলের রোগ, আছে শুধু মিথ্যার বঞ্চনা আর আত্মার লাঞ্ছনা, আছে শুধু মানুষের অপমান আর অনৃতের অবদান। সেদিন হবে মহাবিপ্লব, আমরা যাকে বলি মহাপ্রলয়। সেদিন মিথ্যা আর পুরাতন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ সেই ধ্বংসের মধ্যে আবার নতুন জীবন পত্তন কর্‌বে। আবার সে সেই প্রথম থেকে আরম্ভ কর্‌বে। আবার সে নীচে থেকে উপরে উঠ্‌তে থাক্‌বে, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হ'তে থাক্‌বে, অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হ'তে থাক্‌বে। মানুষের মন প্রাণ যতদিন আছে ততদিন তার একটা কিছু কর্‌বার থাকা চাই। পারা যেমন দেহে থাক্‌লে তা কোন আকারে না কোন আকারে ফুটে বেরুবেই, মানুষের মন প্রাণ তেম্‌নি কর্ম্মের ভিতর দিয়ে কোন আকারে না কোন আকারে ফুটে বেরুবেই। ডিনামাইট আর আগুন একসঙ্গে থাক্‌লে তা ফাট্‌বেই। মানুষের প্রাণ হচ্ছে ডিনামাইট আর তার মন হচ্ছে আগুন। এই দুই একত্র হ'য়ে হাজার রকম জীবনের বাজি যুগযুগান্তরে ফুট্‌ছে। এম্‌নি করে' চতুর্যুগের লীলা চল্‌ছে। এই লীলার মাঝে যারাই বসে' পড়্‌বে তারাই অন্যের পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে যাবে। অবশ্য আমার এ আইডিয়া তোমাকে বেদবাক্য বলে' মেনে নিতে বল্‌ছিনে।

ঐ দেখ কথায় কথায় কোথায় এসে পড়্‌লুম। চিঠি লিখ্‌বার একটা মস্ত সুবিধা এই যে এতে মনের রাশ টেনে রাখ্‌তে হয়

না। মনের সাধে যা খুসী লিখে যাও, চিঠি যার কাছে যাচ্ছে তার কাছে সে হিজিবিজির একটা মূল্য থাক্‌বেই, কারণ তার সঙ্গে সম্বন্ধ সে যে চিঠি লিখ্‌বার সম্বন্ধ। বিশেষতঃ এরকম পত্রাবলী মাসিক পত্রে ছাপা হলেও সমালোচকের কলমের খোঁচা খাবার কোন আশঙ্কা নেই। অবশ্য আমার কলমের খোঁচা খাবার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ উপলক্ষ্যে যে সমালোচকেরা দোয়াতের কালি তাঁদের নিজের মুখে মাখেন তাতেই মুস্কিল। কারণ ঐ রকম কালি মেখে যখন তাঁরা সদর রাস্তায় বের হন্‌ তখন যাদের কিছুমাত্র artistic sense আছে তাদেরই মনোকষ্ট। যা হোক্‌ আসল কথায় ফিরে যাওয়া যাক্‌। ইয়োরোপের যুদ্ধের কথা।

যা হোক্‌ সত্য যুগটাকে যখন স্পষ্ট করে' জানি নে, অস্পষ্ট করেও জানি নে, তখন সেটাকে বাদ দি। তারপর পাই ত্রেতা। এই ত্রেতা হচ্ছে ব্রাহ্মণের যুগ। তখন ব্রাহ্মণের আধিপত্য। সমস্ত রাজ-রাজড়ারা ব্রাহ্মণের কাছে নত-জানু ও করজোড়। এ যুগে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ হবার জন্যে ব্যাকুল। ত্রেতার পর দ্বাপর। দ্বাপর হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের যুগ, ক্ষাত্রশক্তির যুগ। এ যুগে ব্রাহ্মণের আর তেমন জারিজুরি নেই। এখন দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ হয়ে শস্ত্রব্যবসায়ী। আমার মতে এই দ্বাপর গিয়েছে মুসলমানী যুগ পর্য্যন্ত। তারপর কলিযুগ। এই যুগ হচ্ছে বৈশ্যের যুগ। এ যুগে বৈশ্য প্রধান।

ইয়োরোপের আকাশে আলো জ্বলে না, মাটীতে সোনা

ফলে না। নইলে তারা হয়ত দার্শনিক হ'য়ে ব্রহ্মের সন্ধানে বসে' যেত কিম্বা চাষী হ'য়ে জীবন কাটিয়ে দিত। এই দেখ না আমাদের দেশের মাটীতেও সোনা ফলে আর আকাশেও আলো জ্বলে। তাই আমাদের একদিকে চাষা আর একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী, মাঝে আর কিছু নেই। যা হোক্ ইয়োরোপ তা করতে পারল না। অথচ মানুষের চুপচাপ বসে' থাক্‌বার উপায় নেই—তাকে একটা কিছু করতেই হবে। তাই ইয়োরোপে industry গড়ে' উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য মাথা তুল্‌ল—সাথে সাথে তাদের বৈশ্যবুদ্ধি পাকা হ'য়ে উঠ্‌ল। আর যেহেতু এ যুগ কলি-যুগ—বৈশ্যের যুগ, তাই সমস্ত পৃথিবীটা ইয়োরোপের করতলগত হ'ল।

ইয়োরোপের সকল জাতির মধ্যে আবার ইংরেজের যেমন বৈশ্য প্রাণ বৈশ্য বুদ্ধি তেমন আর কারও নয়। তাই সমস্ত পৃথিবীতে ইংরেজের যেমন রাজ্য বিস্তার হ'ল আর কারো তেমন নয়। ইংরেজের ক্ষাত্রশক্তি তার বৈশ্য বুদ্ধির দাসত্ব করেছে; তাই তার এমন success—কারণ এ বৈশ্য যুগ। তুলোর বস্তার মধ্যে তার তলোয়ার লুকোনো, চিনির ছালার নীচে তার বারুদের ছালা ঢুকোনো, তার man-of-warএর বাহিরটা লিভারপুলের লবণ আর মান্‌চেষ্টারের তাঁতের বিজ্ঞাপনে মোড়া। তাই তাদের এমন সাম্রাজ্য হাতে এল যে পৃথিবীতে ছুপা চল্‌তে গেলে তাদের সাম্রাজ্যে পা না পড়ে আর যায় না। কারণ এ যুগ হচ্ছে বৈশ্যযুগ।

জার্ম্মানী যে চার বছর ধরে' এক রকম সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে তাতেই বুঝ্তে পার তার কি রকম ক্ষাত্র শক্তি। কিন্তু জার্ম্মানী যে হেরে গেল বা হেরে যাবে, তার কারণ সে ঐ ক্ষাত্রশক্তি দিয়ে আরম্ভ করেছিল। কারণ এ যুগ ক্ষাত্রশক্তির যুগ নয়—এ হচ্ছে বৈশ্য বুদ্ধির যুগ।

এখন বৈশ্য-প্রাণের একটা মস্ত দোষ এই যে সে-প্রাণের ধারণ-সামর্থ্য নেই। বৈশ্য যখন ধনী বা শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে তখন মাটিতে তার পা পড়ে না, দৃষ্টিতে তার সত্য পড়ে না—তার মাথাটা ঘুরে যায়। ঠিক ছোট মন হঠাৎ নবাব হ'য়ে উঠ্লে যেমন হয় আর কি। তাই বৈশ্য ইউরোপ ধনী হ'য়ে শক্তিশালী হ'য়ে মনে কর্তে লাগ্ল যে এই যে পৃথিবীটা তা পত্তন গড়ে' উঠেছে তারই হাতের চাপে। আর মানুষের সভ্যতা হয়েছে এই জুলিয়স সিজারেরই কয়েক বছর আগে। আর সেই সভ্যতার শেষ পরিণতি 'ক্রিশ্চিয়ানিটি"। তাই ক্রিশ্চিয়ান ছাড়া অর্থাৎ ইউরোপ ছাড়া পৃথিবীর আর সব জাতি আর সব দেশ অসভ্য বন্য বর্ব্বর। এক ইয়োরোপই হচ্ছে superior person, white manই হচ্ছে chosen of God. তাই white manএর burdenএর অন্ত নেই। তার সমস্ত অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে সভ্য করে তুল্তে হবে, তা সে আফ্রিকার হটেন্‌টটই কি, আর মাঞ্চুরিয়ার মাঞ্চুই কি। জগতের মানুষের দেহের উপরে তার হ্যাট কোট প্যাণ্টুলন, চেয়ার, টেবিল, চা-চুরুট চাপিয়ে দিতে হবে, তাদের মনের ওপরে তার শিল্প বাণিজ্য

সায়েন্স বিছিয়ে দিতে হবে, তাদের জীবনের ভিতরে তার কাব্য কথা-সাহিত্য ফিলজফি ঢুকিয়ে দিতে হবে। অবশ্য ইয়োরোপের ও-চেষ্টাতে সমস্ত জগৎই আর কিছু ইয়োরোপ হ'য়ে যেত না।

ইয়োরোপের মনে এইরূপ ভাবের জন্ম কোন সত্যদৃষ্টি থেকে হয় নি—হয়েছে তা তার অত্যধিক অহংজ্ঞান থেকে।

নদীতে বান এলে জায়গায় জায়গায় ঘুর্ণী পড়ে। ইয়োরোপের এই অহংকারের বানে জার্ম্মানীতে পড়ল ঘুর্ণী। ইয়োরোপ বলে, আমি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জার্ম্মানী বল্‌লে—আমি ইয়োরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—আমার শিল্পকলা সায়েন্স ফিলজপি আমার সভ্যতা আমার kultur সে হচ্ছে স্বয়ং ভগবানের গড়া—এর তুলনায় ইয়োপের অন্যান্য জাতির সভ্যতা—সে হচ্ছে বর্ব্বরতা। সুতরাং এ সভ্যতা সমস্ত ইয়োরোপকে, সমস্ত জাতিকে মাথা পেতে নিতে হবে। যারা মাথা পেতে না নেবে তারা ভগবান্-বিদ্বেষী সুতরাং শয়তানের অনুচর। তাদের এ জগতে থাক্‌বার হুকুম নেই। আমি ভগবানের কাছ থেকে চাপরাশ পেয়েছি—যারা এ kultur মাথা পেতে না নেবে, হয় তারা আমার হাতে মরবে, নয় আমার সঙ্গীনের আগে এ kulturকে তাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দেব। যুদ্ধ বাধ্‌ল। জার্ম্মনী এক ছটাক নুন-জলের সঙ্গে বেলজিয়মকে গ্রাস ক'রে ভগবানের বিশ্বরূপের মতো বিরাজ কর্‌তে লাগল!

ইয়োরোপ তখন শিউরে উঠল। এত বড় সাংঘাতিক অবস্থা,

ইয়োরোপ সমস্ত জগতের উপর যে ব্যবস্থাটা চালিয়ে এসেছে, জার্ম্মানী আজ সেই ব্যবস্থাটা সমস্ত ইয়োরোপের ওপরে চালাতে চাইলে! ইয়োরোপ জার্ম্মানীর মুকুরে নিজের চেহারা দেখ্‌তে পেলে। দেখে বড়ই বিশ্রী লাগ্‌ল। তাইত, যারাই ছোট যারাই দুর্ব্বল তাদেরই নিজের কোন আত্মা নেই,—এই এত বড় মিথ্যে কথাটা মান্‌তে হবে। King Wiliam দুর্ব্বল বলে তাকে Kaiser Wilhelmএর কথানুসারে চল্‌তে হবে? Mr. Smith ভাল হাতুড়ি-পিট্‌তে পারে না বলে Herr Schmidt তার কাঁধে এসে চাপবে? না—ইয়োরোপ বুঝবার আগে তার অন্তর থেকে উত্তর এলো—না—কখনও না—কিছুতেই না। যে মন্ত্রটা ইয়োরোপ এতদিন পৃথিবীর ওপরে চালিয়ে এসেছে, সে মন্ত্রটা তাদের নিজের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত দেখে ইয়োরোপ তার বীভৎসতা দেখ্‌তে পেলে। তখন আমরা শুন্‌তে পেলেম কতগুলো কথা, যা কোনদিন ইয়োরোপকে উচ্চারণ কর্‌তে হবে বলে'সে স্বপ্নেও ভাবে নি—small nations, self-determination ইত্যাদি। এই হচ্ছে এই যুদ্ধেরআসল লাভ, যে, ইয়োরোপ তার নিজের চেহারা নিজে দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু মনে কোরো না যে ইয়োরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েছে বলে' রাত পোহালে সে গরদের জোড় পরে টিকি রেখে "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌" জপতে বসে' যাবে—তা নয়। জানই মানুষের স্বভাব যায় না মলে'। স্বভাবের পরিবর্ত্তন করতে হ'লে উপযুক্ত সময় চাই, কঠোর সাধনা চাই।

মনে থাকে যেন ইয়োরোপের এ সময়ের যোগান দিতে হবে আমাদের, তার সাধনায় সাহায্য করতে হবে আমাদের।

এই দেখ তোমার চার পৃষ্ঠা চিঠির জবাব লিখ্‌তে কত চার পৃষ্ঠা পেরিয়ে গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই। এত বড় চিঠি লিখলুম তোমার আগের যে-সব চিঠির উত্তর দিতে পারিনি তারই সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দেওয়া হিসেবে। তা সুদ ত সুদ, একেবারে চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত এসে পড়েছি। সুতরাং এখানেই থামা যাক্‌।

চক্রবৃদ্ধি কথাটাকে একটা প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক term বলে ধরে নিও না। ও-শব্দের মানে হচ্ছে সুদের সুদ—ইস্কুলে আঁক কস্‌বার সময় আমরা যাকে বলতুম compound interest.

আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি

তোমার চিরকেলে অশান্ত।

———

২৪শে ফেব্রুয়ারী,
১৯১৯।

অমর !

তুমি আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সকাল দশ ঘটিকা এগার মিনিট বার সেকেণ্ডের সময় তোমার শ্রীহস্তের একখানি পত্র আমার এ দীনের কুটীরে এসে পৌঁছল—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"।

যাহোক তোমার চিঠি পড়ে এতদিনের নীরবতার কারণ বুঝ্‌লুম। চিঠিখানায় আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত একটা অভিমানের সুর ফুটে উঠেচে।

"ইউরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েচে বলে যে, সে রাত পোহালে গরদের জোড় পরে টিকি রেখে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদম্ বল্‌তে বসে যাবে তা নয়,"—আমার এ কথায় তুমি রাগ করেচ। আমাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে অমন ironical মনের ভাব তুমি আমার কাছে থেকে আশা কর নি; লিখেচ, এতে তোমার অন্তরে একটা আঘাত লেগেচে। কিন্তু ও-কথা আমি ironically লিখি নি—অমন একটা apt allusion আমি আর কোথাও খুঁজে পেলুম

না, তাই ওটা লিখেচি। ওটার মধ্যে একটা সত্যের চেহারা দেখতে পাই বলেই ওটা অমন জায়গায় ওমনি করে লিখেছিলুম। এতে তোমার বা আর কারো অভিমান করবার কি আছে জানি নে।

তুমি আমায় ঘোর materialist বলেছ,—আমার materialism নাকি আমার পত্রে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। আমার চিঠিতে যে microscope দিয়ে materialism-এর সূক্ষ্ম পরমাণু কোথা থেকে বের করলে, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অতীত। তোমার বিশ্বাস, আর শুধু তোমারই বা বলি কেন, আজকাল এ দেশের প্রায় সবারই বিশ্বাস, যে-কেউ এই জগৎটাকে ফাঁকি বলে উড়িয়ে না দেবে সেই অদার্শনিক, অধার্ম্মিক, অনাধ্যাত্মিক, আসুরিক—সে দৃষ্টিহীন, জ্ঞানহীন, বদ্ধ রুদ্ধ, আসক্ত। এই যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েচে আজ যদি সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা থাকত তবে এই অবস্থাটা দাঁড়াতে পারত না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা তখন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের একটা অতি সহজ সম্বন্ধ থাকত, তখন সংস্কৃত ভাষা আমাদের মুখে মুখে থাকত বলে আর তখন সেটাকে দেবভাষা আখ্যা দিতুম না; সুতরাং আমাদের আত্মার চাইতে পদে পদে তার একটা বড় মূল্য দিয়ে বসতুম না। যে-লোকটা লিখতে পড়তে জানে না বা অতি কম জানে তার কাছে যে ছাপার হরফের মূল্য কি, আর কতটা, তা ত সেই Scotch peasant-ই প্রমাণ করেছিল, যখন সে তার শেষ যুক্তি দাখিল

করে এই বলে যে, I saw it in print. আমরা যখন সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করি, বিশেষতঃ তার দর্শনের কোঠায়—তখন আমাদের মাথা ভয়ে ভক্তিতে অমনি নত হয়ে আসে. তারপর ঐ মাথা-নত অবস্থা এমনি অভ্যাস হয়ে যায় যে যখন সে-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি তখনও আর ঘাড় সোজা হতে চায় না। কেবল যে সোজা হতেই চায় না, তাই নয়—সোজা হওয়াটাই তখন একটা মস্ত অ-ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় হয়ে উঠে। কেবল তাই নয় আমরা লক্ষ করা নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুই জনা সংস্কৃত জানিনা বলে, জানলেও তা পড়বার ইচ্ছে বা অবসর হয় না বলে, আর ইচ্ছে আর অবসর হলেও কঠোপনিষদের বদলে ঋতুসংহারই খুলে বসি বলে, সে-কালের দার্শনিক মতগুলো একালে আমাদের কাছে বাজারে-গুজবের আকার ধারণ করে দেখা দিয়েচে। এই যেমন ধর—মায়াবাদ, এই মায়াবাদ যে আসলে কি তা আমিও জানি নে, তুমিও জান না—শঙ্করভাষ্য আমিও পড়ি নি, তুমিও পড় নি—ও রাম শ্যাম যদু কেউ-ই পড়ে নি—শঙ্করের আসল মায়া কি ছিল, তা কেউ জানে না। অথচ সকলের মুখেই মায়াবাদ। ও যে আজ জন্মালো সেও বলচে জগৎটা মায়া, ও যে কাল মরবে সেও বলচে জগৎটা মায়া। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এসে বলচে জগৎটা মায়া, ভিক্ষে পাই গো। গৃহস্থ এসে বলচে—জগৎটা মায়া, চরণধূলি চাই গো। তিলককাটা বৈষ্ণব বলচে—জগৎটা মায়া, এস রাধাকৃষ্ণের নাম করি। রুদ্রাক্ষ আঁটা তান্ত্রিক বলচে—জগৎটা মায়া, এস

কারণ বারি পান করি। এই যে বাজারে সস্তা মায়াবাদের বুলি এই বুলি আওড়ানই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, এবং এই বুলি খেতে শুতে যেতে না আওড়ানোটাই যদি জড়বাদের লক্ষণ হয় তবে আমি যে জড়বাদী তার কোনো ভুল নেই। তবে spirituaism আর materialism-এর সংজ্ঞা ঠিক ঐ কি না সে সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ আছে যে সন্দেহটা এই জগৎটা আছে কি নেই—এ সন্দেহের চাইতে সন্দেহজনক।

(২)

কিন্তু সে যাহোক, আমি তোমায় হলফ করে বলতে পারি যে আমি জড়বাদী নই, কেননা জড়ও যে চৈতন্যেরই বিকাশ এই আমারও বিশ্বাস। আমাদের এই গোঁড়ামীর দেশে যে এক রকম আধ্যাত্মিকতার গোঁড়ামী আছে সেই গোঁড়া আধ্যাত্মিক-বাদীও আমি নই। আমার ঘাড়ে যদি নিতান্তই কোন বাদ চাপাতে চাও তবে যে-বাদটায় তোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ বাধবে না সেটা হচ্চে লীলাবাদ। আমি ভগবানের লীলা মানি। আর এই লীলা মানি বলেই আমি জড়ও মানি চৈতন্যকেও মানি, অর্থাৎ—অন্নকেও মানি, আত্মাকেও মানি, ভোগকেও মানি, যোগকেও মানি—আলাদা আলাদা করে নয়, এক সঙ্গে। আমি যে Kipling নই, সে সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিন্ত, সুতরাং—

"East is east and west is west
And never the twain shall meet"

এত বড় একটা কথা বলবার সাহস আমার নেই। আসলে অন্ন ও আত্মার মধ্যে বিরোধটাই আমার কাছে স্পষ্ট নয়, তার চাইতে ঢের বেশি স্পষ্ট তাদের মিলনের দিক এবং সেই দিকটাই হচ্চে মঙ্গলের দিক, কল্যাণের দিক। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে কিনা জানি নে, কিন্তু আমরা এই কথা সমর্থন করবার জন্যে আমি তোমায় উপনিষদ থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু যা বাঙলায় বল্লুম তা যদি না মান্, তা সংস্কৃত শ্লোক তুল্লেই যে অমনি বুঝে যাবে—এ কথা মনে করা আসলে তোমার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করা; কিন্তু আর যাই হোক সে কটাক্ষ তোমার বুদ্ধির প্রতি আমি করতে পারি নে। কিন্তু উপনিষদথেকে এই যে-শ্লোক তুল্লুম না, সেই শ্লোকই প্রমাণ যে সেকালে ঋষিদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কাঁধে পাখা লাগিয়ে দিবারাত্র আকাশে উড়ে বেড়াতেন না, কেবল বায়ু সেবন করে'।

(৩)

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার একটা মস্ত বড় আপত্তি কি জান?—সেটা হচ্চে এই যে, তা এত ভীষণ লম্বা যে আমরা মেপে তার হিসাব করে উঠতে পারি নে;—আর যদি বা পারি তবু সে হিসেব মনে করে রাখতে পারি নে। ওর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিই চলে না—মাঝপথ পর্য্যন্ত এসে, তারপর হয় দৃষ্টি থেমে যায়, নয়ত ঝাপসা হয়ে আসে। যেখান পর্য্যন্ত

এসে আমাদের দৃষ্টি থেমে যায় ঐ সেইটেই হচ্চে "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগ"—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা চলে' আমাদের মধ্যযুগ। এ যুগে ভারতীয় চিন্তা-জগতে একটা বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছিল এবং এইভাবকে আশ্রয় করে একটা নতুন দর্শন গড়ে উঠল। এর van guard হচ্চেন বুদ্ধ, আর rear guard হচ্চেন শঙ্কর। আমরা আমাদের জাতীর অতীতের লম্বা রাস্তায় ঠিক ঐখানটা পর্য্যন্ত দেখত পাই বলে আমাদের আজ সবারই মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, সে ধারণাটা হচ্চে এই যে, আবহমানকাল থেকে হিন্দুর ভারতে ছিল মাত্র দুটি জিনিষ—এক পর্ণকুটীর আর শীর্ণ ঋষি।

সে কালের ঋষিরা সবাই শীর্ণ ছিলেন কিনা সে তর্ক না হয় না-ই তুল্লুম কিন্তু ঐ কারণেই আজ আমাদের চোখের স্নমুখে নৈমিষারণ্যের বৃক্ষলতাগুল্ম এমনি নিবিড় হয়ে উঠেচে যে তা ভেদ করে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর রাজপ্রসাদের উঁচু চূড়া একটুও দেখা যাচ্ছে না, সৌতি সনকাদি ঋষির মুখে চাপ দাড়ি এমনি কাল হয়ে উঠেচে যে পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের মাথার স্নবর্ণ মুকুট একটুও চোখে পড়চে না। তাই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের একটি অক্ষরও আজ আমাদের মনে নেই, আর মনে থাক্‌লেও তা অতি যত্ন করে মুখে আনি নে। কেন না মুখে আনলেই তার একটা যুক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে দিতে জান হয়রাণ হয়ে যাবে। তার বদলে আজ আমরা আওড়াচ্চি—"মায়াময়-মিদমখিলং হিত্বা" অথচ যখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের জাতির দুর্দ্দশা

হ'ল কেমন করে? সোজা উত্তর—ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েছে বলে। এখন জিজ্ঞেস কর—ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি?—তখন দেখবে পাঁচ জনের মধ্যে চার জনের সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই, আর বাকি একজন এমনি উত্তর দেবে যাতে হাসির চোটে পিলে ফাটে। সেদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—"আচ্ছা বলুন ত আমাদের ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি?" তিনি উত্তর দিলেন—"বাপুহে ধর্ম্মের অধঃপতনের আর বাকি কি, আজকাল ব্রাহ্মণরাও যখন রেলগাড়ী চাপছে।" ব্রাহ্মণ এমনি ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলেন যে, তাঁর ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটা উপনিষদে স্থান পাবার যোগ্য। অথচ এটা কারো কাছেই শুনবে না যে, আমাদের যে ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েচে এবং যার জন্যে এমন দুর্দ্দশা হয়েচে সেটা হচ্চে "মনুষ্যত্ব" ধর্ম্মের অভাব। আমাদের প্রথম ধারণা যে মানুষ আসলে হচ্চে কচিখোকা, তাকে জন্মথেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শাসনে রাখতে হবে। আর আমাদের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, মানুষ নামক জীবটি আসলেই কু, ভাষায় যাকে বলে হাড়পাজী। তাকে এতটুকু স্বাধীনতা দিয়েচ কি সে গিয়ে নরকের পথে নেমেচে, অর্থাৎ—মানুষের আসল সদিচ্ছাটাই হচ্চে তার নিজের ধ্বংস সাধন করা—এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচবার জন্যে আমাদের ঘরে বাইরে বন্দোবস্ত। বাইরে অস্ত্র আর ঘরে শাস্ত্র। এই সব কথা শুনতে শুনতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে, মানুষের আত্মঘাতী না হয়ে বেঁচে থাকবার একই উপায় আছে—সেটা

হচ্চে পরবশ্যতা। এর পাল্লায় পড়েই মানুষের ধর্ম্মের বিকাশ হতে পারছে না, যে বিকাশ হচ্চে মানুষের আনন্দের ও স্বাধীনতার বিকাশ। অথচ আমাদের সবারই ধারণা যে আমাদের যা-কিছু দুঃখ, তা হচ্চে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ সেটা মানি নে বলে। কিন্তু সবার চাইতে মজার কথা হচ্চে এই যে, আজ আমাদের নজর পরপুরুষের অস্ত্রের উপরে পড়েচে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি মোটেই পড়ে নি—ভিতরের বাঁধনই যে বড় বাঁধন—এ কথা আমরা চোখ মেলেও মানি নে। তারপর বিশেষতঃ আমরা যখন আজ সবাই পলিটিক্যাল, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা একেবারেই দেশদ্রোহীতার পরিচায়ক। আমরা জাতিটা কি না আধ্যাত্মিক তাই বাইরে থেকে যা আমাদের চর্ম্মের উপরে এসে পড়েছে তাই আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিন্তু ভিতর থেকে যা আমাদের মর্ম্মের উপরে পাথর চাপায়ে রেখেচে তা আমাদের মোটেই চোখে পড়চে না। দিব্য-দৃষ্টি আর কাকে বলে—বল?

(৪)

ধান ভানতে শিবের গীত এখানেই শেষ করা গেল। এখন শোন লীলাবাদ আমি মানি বলে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি?

তুমি হাজার সাত্ত্বিক হ'লেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু তোমায় একটি কথা বলে রাখচি যে কেবল সাত্ত্বিকতাকে আশ্রয় করে একটা মানুষ বসে থাকতে পারে; কিন্তু একটা সমাজ বা জাতিকে গড়িয়ে বেড়াতে হবে। ইউরোপে যে এত Balance of power-এর কথা শোন, একটা কোনো সমাজের মঙ্গল চিরকাল ধরে রাখতে চাইলে সেই সমাজের মানুষদের মধ্যেও তেমনি একটা Balance of সত্ব, রজ, তম চাই। এই কলিযুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—ত্রেতায় যখন ধর্ম্ম ছিল এখনকার চাইতে তিনগুণ, তখনও কিন্তু বিশ্বামিত্রকে আসতে হইয়েছিল দশরথের কাছে, রামলক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে তাড়কাসুর বধ করবার জন্যে। ত্রেতাতেই যখন এই তখন কলিযুগের কথা অনুমান করেই নিতে পার। বায়ুপিত্ত কফের সামঞ্জস্যেই মানুষের দেহের স্বাস্থ্য—স্বত্ব রজ তম—এই তিনের সামঞ্জস্যে সমাজদেহের মঙ্গল। খালি সাত্ত্বিকতায় দেহটা আত্মা হয়ে সমস্ত মানুষটা আকাশে মিলিয়ে যাবে, খালি তামসিকতায় আত্মাটা জড় হয়ে সমস্ত মানুষটা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে, চাই এ দুয়ের মাঝে রজ। রজ দু'হাত দিয়ে দু' দিককার সত্ত্ব ও তমকে টেনে রাখবে। সত্ত্বকেও উড়তে দেবে না, তমকেও লুটতে দেবে না: তবেই মানুষ নামক জীবটির মঙ্গল—ভগবানের এই লীলার মাঝে। কিন্তু রজও যদি অতিরিক্ত প্রবল হয়ে উঠে তা হলেও ঘটবে আবার দুর্ঘটনা। রজটা হচ্চে আগুন—এই আগুন যদি টু-হানড্রেড ডিগ্রী ফারেন্‌হিটে উঠে যায় তবে তৎক্ষণাৎ একদিকে

আত্মাটা বাষ্প হয়ে যাবে, আর একদিকে দেহটা ভস্ম হয়ে ধ্বসে পড়বে। তিন গুণের এই তিন অমঙ্গল থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে তার জীবনে এ তিনের একটা Balance (সামঞ্জস্য) স্থাপন করতে হবে। মানুষ তার ত্রি-গুণকে অতি সহজেই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে সেই দিন, যেদিন সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে সে তার প্রকৃতির দাস নয়—সে তার ঈশ্বর।

(৫)

তুমি এইখানে একটা কথা বলতে পার যে সত্ত্ব ও রজকে না হয় মানলুম—কিন্তু তমর দরকারটা কি?—দরকার আছে। জান ত জাহাজের খোলে ballast পূরে দেয়—জাহাজের তলা ভারি রাখবার জন্যে। নইলে বাতাসের একটু জোরে আর ঢেউয়ের একটু তোড়ে জাহাজ এমনি হেলবে দুলবে যে, তাতে জাহাজের স্থৈর্য্য রক্ষা করা দায় হবে। তমটাও হচ্চে মানুষের প্রকৃতিতে ঐ ballast, এই তমের ভারেই মানুষ কোনো রকমে মাটীর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ তম-এ যদি মানুষের তলা ভারি না থাকত তবে সে কোন্ দিন প্রস্‌পেরোর এরিয়েল বা এঞ্জেল গেব্রিয়েলের মত পাখা মেলে আকাশে উধাও হয়ে যেত। এ তম আছে বলে সত্ত্ব তাকে উড়িয়ে নিতে পারছে না, রজও তাকে পুড়িয়ে দিতে পারছে না।

অবশ্য যাঁরা মায়াবাদী বা নির্ব্বাণবাদী তাঁদের কাছে আমার এ মত উপস্থিত করাই ধৃষ্টতা। কেননা তাঁদের পক্ষে সমস্ত

দেহটা আত্মা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেই বা কি আর সমস্ত আত্মাটা দেহ হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেলেই বা কি—ওদুয়ের একই ফল, অর্থাৎ—সমাধি। কিন্তু তুমি যদি লীলাবাদ মান তবে আমার কথাগুলো এক দৃষ্টিতেই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার করে দেখবে কি?

(৬)

তোমাকে নিশ্চয়ই আজ আমাদের এই নব জাগরণের যুগে, যখন আমরা সবাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে এমন কি বেকাজে পর্য্যন্ত গীতার শ্লোক আওড়াই তখন একথা নতুন করে জানিয়ে দিতে হবে না যে আমাদের দেহের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে আত্মা বড়, অর্থাৎ—যা যত বেশী অদৃশ্য তা তত বেশী প্রধান। এ তিনের মধ্যে আত্মা জিনিষটা এত অদৃশ্য যে বিদ্যাপতির ভাষায় "লাখে না মিলিল এক", যে তার খোঁজ খবর পায়? সুতরাং ঐ আত্মার কথাটা ছেড়েই দেওয়া যাক। বাকি রইল দেহ ও মন, এ দুয়ের মধ্যে মন বড়। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই, অর্থাৎ—যাঁরাই হিন্দুসমাজে বসবাস করছেন, তাঁদের এই মন নামক জিনিষটি interned হয়ে আছে। শাস্ত্রীয় বালুর চরে এই internment-এর camp চারদিক সঙ্গীন কাঁধে শ্লোক-পুলিশ পাহারা দিচ্চে। এই internment ভেঙ্গেছ কি, একেবারে সমাজ থেকে নির্ব্বাসন। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে মান তবে দেহের

internment-এর চাইতে মনের internment অবস্থা যে সাংঘাতিক একথা তোমাকে লজিকের খাতিরে মানতেই হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বুই জনার ওটা খেয়ালেই আসে না। তার কারণ মনের internment অবস্থা দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এবং ঠিক সেই জন্যেই ওটা বেশি মারাত্মক। কিন্তু আর যারই যাহোক, আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে জ্ঞান হওয়া থেকে মনের interned অবস্থা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি।

উপরে আমি কেবল তোমার কাছে থিওরিই দাখিল করেছি সুতরাং তার ব্যাখ্যা দিতে আমি ন্যায়ত বাধ্য।

জন্ম থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন যে কেমন ভাবে চালিত হয় তার রঙ্গ-রসহীন ইতিহাস এখানে তোমায় না হয় নাই দিলুম। উপরে যে থিওরি দাখিল করেছি, কেবল আমার জীবনের দুট ঘটনা দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করব। সেই যে দুটি ঘটনা তা সমাজের কাছে হয়ত অতি অকিঞ্চিৎকর, এমন কি নেহাৎ বাজে, কিন্তু আমার কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। এ দুটি ঘটনা ঘটলে সমাজের কোনো ক্ষতি হত না অথচ আমার পরম লাভ হত। এ দুটি ঘটনার কথাই তোমার জানা আছে। প্রথম আমি বিলেত যেতে চেয়েছিলুম আর দ্বিতীয়টা হচ্চে এই যে আমি তোমার ভগ্নিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওর প্রথমটা ঘটল না, কারণ পূজ্যপাদ তোতারাম স্মৃতিশিরোমণি মহাশয়—যাঁকে

আমার দাদামশাই ইষ্টদেবতার মত দেখতেন—তিনি স্পষ্ট করে আমার ঠাকুরদা'কে শুনিয়ে বলেছিলেন যে নোনাজলের গন্ধ যার নাকে ঢোকে তার এদিকে ওদিকে অর্থাৎ—ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম গোণাগাঁথা একশ' তিরাসি পুরুষের বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে আণ্ডাবাচ্চা সবারই নরকবাস নিশ্চয়। আর ওর দ্বিতীয়টি ঘটল না তার কারণ আমার নাম শ্রীমান্ অশান্তকুমার "ভট্টাচার্য্য" আর তোমার বোনের নাম শ্রীমতী শান্তিলতা "গুপ্তা"। এর মানে হচ্চে এই যে, আমার মধ্যে মন বলে যে একটি জিনিষ আছে সেই মনের দুটি বিশেষ চিন্তা, দুটি heroic ইচ্ছা যার জন্যে আমি নিজে দায়ী, সেই দুটি চিন্তা কর্ম্মে অনূদিত হল না বাইরের চাপে, সমাজের চাপে। মন বিরক্ত হয়ে বললে—এই ত তোমার সমাজ, এখানে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দেওয়াই প্রশস্ত, এখানে চিন্তা করতে যাওয়াই ঝকমারি, এখানে মন যদি জাগে, মন যদি সংকীর্ণ জায়গা থেকে একটুকু ফুটে ওঠে অমনি চারদিক থেকে সমাজ তাকে চাপতে থাকে। এমন অবস্থায় মন বেচারী কি করে, সে ঘুমিয়ে পড়ল, মন যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন জীবন বললে—মন যখন ঘুমল তখন আমি আর জেগে থেকে কি করব। তখন সে চোখ বুঁজে দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। চারদিকে বাইরে কত না হৈ চৈ কত না হাসিকান্না রাগ রঙ্গ। চোখবোঁজা জীবনের কাছে সে সব স্বপ্নের মত এসে পৌঁছতে লাগল।

কিন্তু সে যাহোক্ এইখানে বাঙালীজাতি আজ যে অবস্থায়

এসে পৌঁচেছে সে-অবস্থায় যে শ্রীমান্ ভট্ট ও শ্রীমতী চট্টোর বিয়ের, সঙ্গে শ্রীমান্ "ভট্ট" ও শ্রীমতী "গুপ্তা"র বিয়ের, কি মানসিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি ব্যবহারিক কোনো দিক থেকে একটুকুও প্রভেদ নেই কিংবা আমি বিলেত গেলেই যে সমস্ত ভারত মহাদেশটা ভারত মহা-সাগরের নীচে তলিয়ে যেত না—এসম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে পারতুম, যে বক্তৃতাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ দুয়েরই রক্ত গরম হয়ে উঠত; কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র চিঠির পৃষ্ঠা ও তোমার গোলদীঘিও নয়, গড়ের মাঠও নয়। সুতরাং অসাধারণ শৌর্য্যে সে-লোভ সম্বরণ করে ঐ যে দুটি ইচ্ছা আমার সম্পাদন হল না তার ভিতরের দিকটার একটা কথা তোমায় বলব।

এইখানে আমি তোমার কাছে স্পষ্ট করে কবুল চাচ্চি যে, আমি বিলেত গেলেই যে আমার সুমুখে শক্ত দুটো শিং বা পিছনে লম্বা একটা লেজ গজিয়ে যেত বা তোমার বোনকে বিয়ে করলেই যে হোমরুল ফলটা—যা আজ ভীষণভাবে ডানে বাঁয়ে দুলছে, তা টক্ করে বোঁটা ছিঁড়ে আমাদের একেবারে নাকের ডগার উপরে এসে পড়ত, তা নয়! কিন্তু ঐ যে দুটি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ দাঁড়ালে—এই ঘটনাটার পিছনে একটা Principle আছে, যেটা সমাজের পক্ষে মারাত্মক। এই Principle-টা হচ্চে এই যে, সমাজ তার প্রত্যেক সভ্যদের বলচে—দেখ তোমাদের ভাবতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না, কোন বিষয়ে

ইচ্ছা করতে হবে না। আমি আছি, আমার বাঁধা নিয়মের পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাও, তাতেই তোমার মোক্ষ।

এই বন্দোবস্তে প্রথমতঃ মানুষ নামক জীবটি ব্যর্থ হয়ে উঠছে, কেন না মানুষ ত কল নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, ইচ্ছা আছে, Will আছে—কিন্তু সমাজ মানুষের এই সকলের মুক্তগতি দিতে নারাজ। সমাজ বলছে—মানুষ তোমার মন চাই নে, বুদ্ধি চাই নে, কল্পনা চাই নে, ইচ্ছা চাই নে, Will চাই নে—চাই তোমার স্মরণশক্তি, চাই তোমার মুখস্ত কর্‌বার বিদ্যে। এই রকম করে সমাজ যখন তার সভ্যদের কেবল হুকুম তামিল করবার যন্ত্র করেই তুলচে—এর শেষ কুফলটা আবার গিয়ে সমাজের বুকেই বাজচে।

সমাজ নামক জিনিষটিকে যদি বিশ্লেষণ কর তবে দেখবে যে, সমাজ প্রাণবন্ত, সমাজ শক্তিমান। আসলে সমাজ আর যাই হোক বহুব্রীহি সমাস নয়। এ প্রাণ এ শক্তি সমাজ প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকেই আহরণ করছে। সুতরাং যখন সমাজের সকল সভ্যই, কি মনের দিক থেকে, কি চিন্তার দিক থেকে কি কল্পনার দিক থেকে কি শক্তির দিক থেকে, একেবারে শূন্য ; তখন সমাজ তাদের কাছ থেকে কেবল শূন্যই লাভ করতে পারে। আসলে জড়জগতে ও মনোজগতে একটা প্রভেদ আছে। দশখানা কঞ্চি একত্র করলে তা বাঁশের মত মোটা ও শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু দশজন 'বোকাকে একত্র করলে 'একজন স্যর অ্যাইজ্যাক নিউটন হ'য়ে উঠে না।

সুতরাং চাই ব্যক্তিগত মানুষের মুক্তি—তার চিন্তার মুক্তি, কর্ম্মের মুক্তি—এই মুক্তির ভিতরে যে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার আনন্দে প্রত্যেক মানুষটি তার সমাজকে আনন্দময় করে তুলবে, তার প্রাণের গতিতে মনের কল্পনায় বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজকে পূর্ণ করে তুলবে—তখনই আমরা দেখতে পাব সমাজ-দেবতা একটা কাঠের পুতুল নয় বা East End Co-র দম দেওয়া ঘড়ি নয়—সে দৃষ্টিবান, জ্ঞানবান ও শক্তিমান। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজ সত্যকে পাবে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রেমকে পাবে ও শক্তির ভিতর দিয়ে সম্পদ ও গৌরবকে লাভ করবে।

লিখতে লিখতে চিঠি প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। সময়ও যায়। কাজেই এখানেই দাঁড়ি টানলুম। কেন না তোমাকে আমি একটা example set করতে চাই। সে example-টা হচ্ছে এই যে, ভদ্রলোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার উত্তর সাড়ে চার মাস দেরী না করে' সেই দিনই দেওয়া। ইতি—

তোমার চিরকেলে

অশান্ত।

———

এপ্রিল ২২, ১৯১৯।

জীবনকুমার

তোমার উপরে আমি যে মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলুম সেটা তোমার কাছে আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেননা তোমার শেষ চিঠি পড়ে' একেবারে ডবল খুসি হয়েছি। তুমি হয়ত মনে মনে ভাববে যে, সে চিঠিখানার মধ্যে এমন কি অপরকে খুসি করবার মত পরমাশ্চর্য্য খবর ছিল! তা যে-খবর ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটা কিছু করবে বলে' মনস্থ করেছ।

আমার দ্বিতীয় দফা খুসি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছ। আমার বিশ্বাস যে, "Pen is mightier than the sword." এ-কথাটা একটুকু অতি-রঞ্জিত ও নয়, অতি-মণ্ডিতও নয়। লেখনী অসির চাইতে mightier ত বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা subtler-ও। ব্রাহ্মণের স্থান যে ক্ষত্রিয়ের চাইতে উঁচুতে ধরা হয়েছে সেটা খামখেয়ালেও নয় বা খোসখেয়ালীতেও নয়। অসি দান করে—মৃত্যু, আর লেখনী—অমৃত। অসি জীবন নিতেই পারে—লেখনী জীবন দিতেও পারে। তাই ত এ দেশে আজ লেখনীর এত প্রয়োজন, অবশ্য যদি সেই লেখনীর পিছনে এমন

একটা মস্তিষ্ক থাকে যে-মস্তিষ্কের চিন্তাশীলতা অধর্ম্ম নয় অকর্ম্মণ্যও নয়। তবে তুমি সাহিত্য-মন্দিরে পূজারি হয়ে কেবলই 'পুরোনো মন্ত্র আওড়াবে, না নিজে উদ্যোগ করে' সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ধ্যান ধারণাও করবে তা শুধু তোমার উপরেই নির্ভর করে। তবে তোমাকে এইখানে এইকথাটা বলে' রাখছি যে, মন্ত্রের যে গুণ তা মানুষের জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু ইত্যাদি Vocal instruments-গুলোর মধ্যেই নেই, আছে তা তার অন্তরে, যেখানে মানুষ বচনশীলতায় মুখর সেখানে নেই, আছে তা যেখানে সে আত্মোপলব্ধিতে প্রখর। মন্ত্র হয়ে ওঠে কেবল বাক্য, যখন সেই মন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। বাক্যের জোর তখনই, যখন তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্র, মন্ত্রের গুণ তখনই যখন তা মানুষের আত্মার সত্যে ও শক্তিতে অভিষিক্ত।

কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তুমি জীবন উৎসর্গ করবে জেনে সুখী হলেও আমি তোমার একটা প্রশ্ন শুনে একটু দমে গিয়েছি— সাহিত্য-জগতে তোমার সাফল্য সম্বন্ধে। তুমি যে জিজ্ঞেস করেছ, আজ যে বাঙলা দেশের সাহিত্য-সভায় দুটো দল গড়ে' উঠল, যার এক দলকে পুরাতন ও অন্য দলকে নূতন-পন্থী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এই দু' পন্থীর মধ্যে কোন্ পন্থা পান্থজনের শ্রেয়? এ প্রশ্নে তোমার কৃতার্থতা সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই একটু দমে' গিয়েছি এই জন্যে যে, ও-প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে সন্দেহ ও সংশয়। আর সন্দেহ ও সংশয়ের মানে হচ্ছে

নিজের অন্তর থেকে সেই বিষয়ে একটা কোন স্পষ্ট তাগিদ না আসা। অন্তরের এই তাগিদই হচ্ছে মানুষের সত্য ; সুতরাং সেই পন্থাই তার পন্থা। মানুষ যতক্ষণ না এই রকম তাগিদ তার অন্তর থেকে পায় তৎক্ষণই তার প্রশ্ন—এটা করি না ওটা ধরি ? এ রকম দু' নৌকোয় পা রাখলে আর যাই হোক, নৌকো চলে না। কিন্তু যা হোক এ সম্বন্ধে তোমায় আমি একটা ব্যক্তিগত মত দিতে পারি। আমার দৃঢ় ধারণা যে বাঙলা সাহিত্যে আজ আমরা যে পন্থাই অবলম্বন করি না কেন, আজ আমরা সেখানে বৌদ্ধ দোঁহার সুর ভাঁজতে গেলে যতখানি ঠকব, বৈষ্ণব পদাবলীর তান সাধতে গেলেও ঠিক ততখানিই ঠকব। কেননা আজ আমরা বৌদ্ধও নই বৈষ্ণবও নই—অর্থাৎ অন্তরে।

আসলে পুরাতন পন্থা ও নূতন পন্থা কতকটা সত্যি হলেও ও-সম্বন্ধে তর্কটার অনেকখানিই বাজে। (বাঙালা-সাহিত্য সম্বন্ধে আসল খাঁটি কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, তা প্রথমে বাঙলা হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত তা সাহিত্য হওয়া চাই। এই হলেই আর কোন সংজ্ঞাই সেটাকে বাঙলা-সাহিত্যের ফলাহারে আপাংক্তেয় করে' রাখতে পারবে না।)

এত বড় একটা কথার মুখে তর্কের খাতিরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে, যদি কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক কামস্কাট্‌কা-বাসী এক জোড়া যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করে' একখানা উপন্যাস লেখেন তবে সে গ্রন্থকে বাঙলা-সাহিত্যের

জাতে তুলে নিতে হবে কি না? তা বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে না কি?—নিশ্চয় তাকে জাতে তুলে নিতে হবে। সাহিত্য-বৃক্ষের নানা শাখা যেমন কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি। এখন যদি বাঙালী-ঐতিহাসিক বাঙলা-ভাষায় একখানি মেক্সিকোর ইতিহাস লেখেন তবে তা বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ হবে কি না? মেক্সিকোর ইতিহাস যদি বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে তবে কামস্কাটকার প্রণয়-কাহিনীই বা কেন করবে না? বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের কথা, সেটা নির্ভর করবে তার দোষ গুণের উপরে—তা সাহিত্যের খাঁটি জিনিস, না মেকি মাল—তার উপরে।

এই ধর না কেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঙলা রামায়ণ মহাভারত রচনা করলেন তেমনি যদি কোন কবি ইলিয়ড ও অডেসির গল্প নিয়ে বাঙলা মহাকাব্য রচনা করেন, তুমি কি মনে কর তাহলে তা বাঙলা-সাহিত্যে ফেলা হ'য়ে থাকবে। বাঙালী মনের এমন সংকীর্ণতা হবে না বলে' আমাদের সবারই প্রাণপণে আশা করা উচিত। তা যদি হয় তবে ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট, রোমিও-জুলিয়েত, ওথেলো ইত্যাদি নাকচ, বায়রনের ডনজুয়ান, চাইল্ড-হ্যারল্ড ইত্যাদি কাব্যগুলো নাকচ - ফরাসী-সাহিত্যেরও ঐ রকম অবস্থা দাঁড়াবে। তোমার সূত্র অনুসারে দেখতে পার্চ্ছ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি রকম একটা হুলুস্থূল বেধে যাবে। এর উত্তরে যদি বল যে, অন্য দেশের সঙ্গে বাঙলা দেশের

তুলনা ! বাঙলা দেশ গড়ে' উঠেছে divine dispensation-এ। তবে অবশ্য নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। তবে এইখানে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—

"ইহার চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !

* * * *

থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণ আম্রবন ছায়ে"

এ মনের ভাব মানুষের একটা চিরন্তন ভাব। "আম্রবন ছায়ে"র "ক্ষুদ্র কোণ" যতই গভীর কোণ হোক না কেন যতই মধুর কোণ হোক না কেন, সেই খানেই মানুষের মন চিরকাল আঁটবে না, আঁটবে না। মানুষের জীবন-তারে গুণ গুণ করে একটা সুর চিরদিন গুঞ্জিত হচ্ছে যদি কান পাততে জান তবে কান পেতে শোন, সে সুর হচ্ছে ঐ—

"ইহার চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এই সুর যে থামাতে চায় সে বৃহৎকেই থামাতে চায়, মহৎকেই অস্বীকার করতে চায়—এ যেন সান্ধ্য-আকাশের একটা মাত্র তারার পানে চেয়ে সমস্ত আকাশটাকেই ভুলে যাওয়া—সমস্ত আকাশটাকেই অস্বীকার করা।

সে যা হোক আমাদের সাহিত্যে নূতন ও পুরাতন এই শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা তোমায় স্পষ্ট করে' বলছি।

প্রথমে দু'দলের দু'জনা চরম পন্থীকে নেওয়া যাক। একজন বলছেন—আমাদের অতীতের অনুকরণ কর। আর একজন বলছেন—ইয়োরোপের অনুকরণ কর। আমার মনে হয় এ দু'জনের কেউই বর্ত্তমানে বাঙলা-সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দিতে পারবেন না। কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ হচ্ছে মানুষ যা নয় তারই খেলা করা —যে ভঙ্গীটা আত্মার নয় সেই ভঙ্গীটা তার মনের ভিতরে কল্পনা করে' তাই কালি কলমের সাহায্যে কাগজের উপরে আঁকা। কিন্তু সৎ-সাহিত্য, স্থায়ী সাহিত্য হচ্ছে তাই যাতে ফুটেছে আত্মার চেহারা। কেননা এক আত্মাই হচ্ছে সৎ—আত্মাই হচ্ছে অজর অমর অক্ষয়, কাল তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না। এ হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা—যাঁকে আমরা পূর্ণ অবতার বলে মানি।

আসলে যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমরা চলে' এসেছি সে অতীতকে আজ আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব না, আর আজ যে বর্ত্তমানটা আমাদের সামনে এসে পড়েছে সেটাকে আমরা থুড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে পারব না। আর এতে অপমান বোধ করবারও কোন প্রয়োজন নেই বা এতে প্রাচীন ঋষিদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হ'ল কল্পনা করে' চোখের জল ফেলবারও কোন কারণ নেই।

আমাদের অতীতকে যে আমরা ভুলতে পারব না আর আমাদের বর্ত্তমানকে যে আমরা ভুলতে পারব না—ইচ্ছা

করলেও নয়—এটা বিশেষ করে প্রমাণিত হয়েছে আমাদেরি সাহিত্য-সাধারণ-তন্ত্রের দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে। একজন হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি মাইকেলের জীবনী জান। ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা এদেশে আমদানী হবার পর বিলিতি সভ্যতার ঢেউয়ে মধুসূদন যেমন নাকানি-চুবোনি খেয়ে ছিলেন বাঙলা দেশের কিম্বা সমস্ত ভারতবর্ষের আর কেউ তেমন খান নি। তাঁর আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছিল বিলিতি। কিন্তু তাঁর কলম থেকে স্থায়ী যা বেরুল তা হচ্ছে "মেঘনাদ বধ"। আর এই "মেঘনাদ-বধ" কেউ যদি ইংরাজিতে অনুবাদ করে' বিলেতে ছাপান তবে তা পড়ে' এ কথা কেউ বলবে না যে তা একজন ইংরেজ কবির রচনা। মাইকেলের সার্ট-ওয়েষ্টকোট ফুঁড়ে যে আত্মা বেরিয়েছিল তা আর যাই হোক ইংলিশম্যানের আত্মা নয়।

অন্যদিকে আবার আছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলায় তাঁর যা ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল সেটা চাটনি হিসেবে। এ-দেশে ত তিনি ইংরেজি শিক্ষার"পিল" বরদাস্ত করতে পারলেনই না, বিলেতে গিয়েও যে তিনি সে শিক্ষাকে মটন চপের মতো কাঁটা চামচের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে উদরস্থ করতে পেরেছিলেন তা অন্তত তাঁর "জীবন স্মৃতি" পড়ে' মনে হয় না। তবুও আজ যদি কেউ তাঁর "গীতাঞ্জলি" মৈথিলি ভাষায় রূপান্তরিত করে

ত'বে সেটা বিদ্যাপতির রচনা বলে' কেউ ভুল করতেন না নিশ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন বড় কবি এ কথা তুমি মান। তাঁর প্রতিভা অমানুষী এটাও তুমি স্বীকার কর। এই রবীন্দ্রনাথই একদিন বৈষ্ণব কবিতার রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে সেই সুর আপনার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজীয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন তারই ফল হচ্ছে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়েসে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তোমাকে এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর "জীবন-স্মৃতি" তে লিখেছেন, "ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। * * * *। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গেনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যে নিজের রচনা সম্বন্ধে কেবল বিনয়ই প্রকাশ করেছেন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণের গানে আজ আমরা "দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর" দিতে পারি নে, কারণ এ যুগের আমরা রাধাকৃষ্ণকে ঠিক তেমনি সত্য করে' পেতে পারিনে, যেমন করে' সে যুগের তাঁরা পেতেন। এই দেখছ না আজকাল আমরা

রাধাকৃষ্ণের লম্বা-চওড়া আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সুরু করেছি। আর এইটাই প্রমাণ যে আজকার আমাদের রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির জমাখরচের ফাজিল দাঁড়িয়েছে। আসলে ভক্তির চাইতে আমাদের জ্ঞানের দিকটা বেড়েই চলেছে। তাই আজ গাঁয়ের যমুনার কুলুকুলু রবই আমাদের দু' কান জুড়ে বসে' নেই, আজ ধরণীর সপ্তসিন্ধুর কলকল ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত ভরে' উঠেছে। ভক্তির দোষ সংকীর্ণতা—জ্ঞানের গুণ উদারতা। ভক্তির, সে হচ্ছে কূপ: জ্ঞানের সে হচ্ছে বারিধি। ভক্তির কূপ বলেই হয়ত তা শান্ত ও শীতল, কিন্তু শান্ত ও শীতলতাকে বড় করে বিশালতাকে কে অস্বীকার করবে?

এইখানে তুমি নিশ্চয় তর্ক তুলবে। তুমি বলবে যে রবীন্দ্রনাথের ছেলে বয়েসের কাঁচা রচনায় পাকা রঙের ও রসের আশা করা অন্যায়। এবং সেই আশা করে' এবং তাই না পেয়ে তারই উপরে সমস্ত বাঙালী কবির, তথা সমস্ত বাঙালী জাতির, Mental Psychologyর ব্যাখ্যা দাঁড় করান কেবল তর্কে জয়লাভ করবার জন্যেই। তুমি হয়ত বলবে যে রবীন্দ্রনাথ যদি ঐ পথ প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন তবে হাত পাকবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কলমের মুখ থেকে এমনি সব পদাবলী ফুটে বেরুত যা "খেয়া"র সুর বা "গীতাঞ্জলি"র গানকে ছাড়িয়ে উঠত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গোপবালাদের মতো যে যমুনা-পুলিনের পথ ধরে' চলল না এইটেই মস্ত প্রমাণ যে রবীন্দ্রনাথের তা সত্য

নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথই কেন ?—নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারী-লাল থেকে আরম্ভ করে' সত্যেন দত্ত করুণানিধান পর্য্যন্ত কারো কবি-আত্মাই যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরু ছায়ায় কলম নিয়ে বসে' গেল না। বসবে কি ? যমুনা যে আজ শুকিয়ে উঠেছে—আর কদম্বের শাখা প্রশাখা দিয়ে হয়ত মালগাড়ীর "ওয়াগন" তৈরী হচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে বাঙলার কবিরা সব যোট বেঁধে জোর করে' বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ও গভীরতর সত্যটাকে অস্বীকার করে' আসছেন ? আমি কিন্তু তা মনে করি নে।

মানুষের মধ্যে এক কবির জীবনেই কবি-আত্মার সঙ্গে তার বুদ্ধির সংগ্রাম সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয় তবে কবি অ-কবিই হয়ে উঠতে পারেন, সু-কবি হন না। যা হোক মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখেছেন। কিন্তু শোন "ব্রজাঙ্গনা"য় তিনি লিখেছেন—

নাচিছে কদম্ব-মূলে বাজায়ে মূরলী রে
রাধিকা-রমণ।
চল সখি ! ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি স্বজনি ! শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও-চরণ !

কিম্বা—

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাকে এ বিরলে, সতি!
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে?
অভয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে?

কিম্বা—

কোথা রে রাখাল চূড়ামণি?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গো-ধূলি, কোথায় রহিল মাধব?

কিন্তু আবার এর পরেই "বীরাঙ্গনা কাব্য" থেকে শোন—

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচ কুলোদ্ভবা;
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুল-রাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল—কুসুম—ফল—পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বারে,—মহোৎসব যেন্?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?

কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্ম্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট; গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণাধ্বনি?

আর বেশি শোনাবার দরকার নেই। একদিকে "ব্রজাঙ্গনা" আর একদিকে "বীরাঙ্গনা"। এ দুয়ের সুরে কোন প্রভেদ অনুভব করতে পারো? কোন প্রভেদ দেখতে পাও? এ দুই সুরে ঠিক সেই প্রভেদ, যে প্রভেদ মিথ্যা কথায় ও সত্যের বাণীতে। আসলে মধুসূদন যে ব্রজের গান গেয়েছেন সে গানে সুরও জমে নি আর তালও কেটেছে। তাতে আমাদের "দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর" ফোটে নি। "ব্রজাঙ্গনা-কাব্য" বাস্তবিক পক্ষে ব্রজাঙ্গনাবধ কাব্য হয়ে উঠেছে।

(আসলে আমাদের সাহিত্য সৎ হয়ে উঠবে সেইখানে, যেখানে আমরা সত্য। অতীতের বীজ আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেই, আর আজ আমাদের বাহিরে যে আলোক যে বাতাস রয়েছে, সেই আলোক সেই বাতাসে সেই বীজ যে আকারে ফুটে বেরুবে সেইটেই হবে আমাদের আসল সত্য।) এই আজকার আলোকের পাত যদি আমরা আমাদের চোখে পড়তে না দিই, আজকার বাতাস যদি আমরা আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতে না দিই তবে

আমাদের রক্তে সেই অতীতের বীজ পচে' উঠে আমাদের শরীর মনকেই দূষিত করবে, তাতে করে' সত্যই বল আর সমাজই বল দুয়েরই মরণের পথ ফলাও হ'তে থাকবে। ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের সনাতনত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধত্বই পাকা হয়ে উঠবে, যৌবন তাকে কোন দিনই আক্রমণ করতে পারবে না। এটা অনেকের পক্ষে আরামের অবস্থা হলেও সকলের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

মানুষ চলতে চলতে তার আপনার পরিচয় লাভ করে; মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার মনের চলার নিরিখ। ওই মনের চলা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোই নেই, কোন শাস্ত্রের পাতেও নেই, কোন অস্ত্রের হাতেও নেই। কেননা মানুষের চলাই হচ্ছে তার প্রথম সত্য। কারণ চলারই অর্থ হচ্ছে জীবনকে পাওয়া। আর এ সত্য মানুষের নিজের গড়া নয়—এ সত্য ভগবানের। এই জন্যে হাজার শাস্ত্রও আজ আমাদের বেঁধে রাখতে পারছে না—লক্ষ অস্ত্রও পারবে না।

"অতীত" যতই উৎকৃষ্ট, যতই মহান্‌, যতই যা-কিছু হোক না কেন তার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তা "বর্ত্তমান" নয়। আর "বর্ত্তমানের" একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তা "ভবিষ্যতকে" গড়ে তুলতে পারে। "বর্ত্তমানের" এই সুবিধাকে আঁকড়ে ধরে' যদি আজ আমরা কাজে না লাগাই তবে হয়ত আবার আর একদিন আসবে যখন আবার, "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র" এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে আমাদের তর্ক করতে

বসে' যেতে হবে। বর্ত্তমান যে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ভবিষ্যতকেই গড়ে' তুলতে পারে এর জন্যে দোষী কাল। কাল জিনিসটার পিছনে ফেলে-আসা জিনিসের জন্যে কিছুমাত্র মায়া নেই, তার সমস্ত অনুরাগ অনাগত যে তার জন্যে। মানুষের জগতের এই সব নিয়মকে যত দিন না এক নতুন বিশ্বামিত্র এসে উল্‌টে দিতে পারছেন ততদিন আমাদের সাহিত্যেও এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ করতে পারবে না। ব্যষ্টির জীবনে যাই হোক না কেন সমষ্টি জীবনের দিক থেকে এই কালের প্রভাবকে আমরা জানি বলেই 'কাল-মাহাত্ম্য' 'যুগ-ধর্ম্ম' ইত্যাদি কথাগুলো আমরা মানি।

তুমি হয়ত এখানে বলে' বসবে যে কালকেই কি বড় করে তুলতে হবে? মানুষের will বলে কি কোন পদার্থ নেই, পুরুষকার বলে' কি কোন বস্তুই নেই? কালকে পরম করে' দেখাও যা, দৈবকে চরম করে' মানাও তাই। আর খেতে শুতে উঠতে বসতে যেতে দৈবকে মেনে মেনেই ত এ জাতটা গেছে। জীবনকুমার, তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ভুল পাঠ করেছ। দৈবকে মেনে মেনে এ জাতটা যায় নি, এ জাতটা গিয়েছে পুরুষকারকে না মেনে মেনে। তুমি নিশ্চয় বলবে যে আমি হেঁয়ালি আওড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আর ও-কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে দৈবও সত্য, পুরুষকারও সত্য। কেননা ভগবানও আছেন আর মানুষও আছে। কেবল দৈবকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে জড়, আর খালি পুরুষকারকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে

দানব। তাই বড় মঙ্গল সেইখানে, যেখানে মানুষ ভগবানের সঙ্গে মিলেছে, মঙ্গলে জয় ও জয়ে মঙ্গল সেইখানে, যেখানে মানুষের পুরুষকারের দ্বারা দৈবই সার্থক হ'য়ে উঠছে, যেখানে ভগবানের গুপ্ত-বাণীকে মানুষ আপনার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পেরেছে। ওইখানেই মানুষের পরাজয় নেই, তার জয়ে অমঙ্গল নেই। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে সবার পক্ষে ভগবানের বাণী পাওয়া কি সম্ভব? তা সম্ভব নয় বলেই আমাদের সব সময় পুরুষকারকে জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের সে পুরুষকার আমাদের অজ্ঞাতসারেও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হতে একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবপদাবলী আর কোথায় পুরুষকার। হয়ত আরও কিছুক্ষণ কলম চালালে তার মুখে ভাষাতত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, নেহাৎ পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব কি ঐ রকমের একটা কিছু এসে যাবে। কাজেই আজ এই খানেই কসে' দাঁড়ি টানলুম। ইতি

তোমার সেকালের

মৃত্যুঞ্জয়।

জানুয়ারী ১০, ১৯২০।

অমর,

এবার আর তোমায় বড় চিঠি লিখ্‌তে পার্‌ছি না ভাই। কয়েক দিন হ'ল আমার মনের চারপাশে এমনি একটা জমাট আল্‌সেমি জড় হয়েছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে এমন একটা চাঞ্চল্য এমন একটা বেগ চারিয়ে গেছে যে কেবল বুনো ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু লোকটা আমি নিঃস্বার্থপর কিনা, তাই তোমার সাপ্তাহিক পত্রসাহিত্যে যাতে কম্‌তি না পড়ে তার প্রতি আমার দৃষ্টি আছে। তাই এইসঙ্গে আর একখানি চিঠি পাঠালুম। চিঠিখানি লেখা আমার দাদা-মশায়ের। তিনি এখন কাশীবাস কর্‌ছেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের আমলের মানুষ। এখন বয়েস প্রায় আশী। কিন্তু তাঁকে যদি দেখ্‌তে—কিছুতেই বল্‌বে না যে তাঁর বয়েস আশী। তাঁর বয়েস কেবল তাঁর চুলে। একটি দাঁত পড়েনি—সারা গায়ে একটু কোনখানে চামড়া কুঞ্চিত হয়নি। দেখ্‌লে মনে হয় সত্যযুগের মানুষ। তাঁরি লেখা চিঠি। পড়্‌লেই বুঝ্‌বে বিষয়টা কি। ইতি

তোমার অশান্ত।

ডিসেম্বর ২৭, ১৯১৯।

অশান্ত,

কত দেখ্‌লুম কত শুনলুম, বয়েস ত নেহাৎ কম হয়নি—সেই সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে এ-কাল পর্য্যন্ত দেশের ওপর দিয়ে কালের চক্রটা এমনি বিরাট ঘর্ঘর শব্দে চলে' গেল যে তা অতি অন্ধেরও চোখে পড়ে, অতি কালারও কাণে লাগে!

সেই সেকাল, যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রথম দেশে এলো—ইংরেজি সাহিত্যের স্বাধীনতার বাতাসে বিলেতের সাম্‌নেকার পুরু-পরদাটা যখন উঁকি মার্‌বার মতো একটু সরে গেল—তখন উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের চোখ একেবারে ঝল্‌সে গেল—ভিতরের কথা কেউ বুঝলে না, বাইরে দেখেই তাক্—তাইত ঐ যে ওরা অমন হাসিমুখে সোজা মাথা তুলে সাত সাগরে সদর্পে বিচরণ কর্‌ছে—সে ঐ যে ওরা কোট-প্যাণ্টালুন পরে বলে', কাঁটা-চাম্‌চেতে টেবিলে বসে' খায় বলে', ইংরেজি কথা কয় বলে'। আমরা সেদিন কেউ ভাবতে পারিনি যে কোট-প্যাণ্টালুন যে আমাদের এমন করে' দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল তার কারণ কোট প্যাণ্টালুনের ছাঁট-কাট নয়—তার কারণ এই যে ঐ কোট-প্যাণ্টালুনের ভিতরে এমন একটা মানুষ আছে যা নির্ভুল ভাবে জীবন্ত। আসলে আমাদের মন হরণ করেছিল সেই ভিতরের জীবন্ত মানুষটা, কিন্তু আমাদের বাইরের দৃষ্টি

কোট-প্যাণ্টালুন পর্য্যন্ত গিয়ে আর এগল না। তাই সেদিন আমরা মোটেই মনে কর্‌তে পারিনি, যে, আমাদের এই ধুতি চাদর পাঞ্জাবি লপেটাই মোহন হয়ে দেখা দেবে যদি সেসব এমন মানুষদের শরীর ঘিরে থাকে যাদের সারা শরীর থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে আস্‌ছে—যাদের চোখে আলোর ফুল, ঠোঁটে জীবনের রাগ, নাসারন্ধ্রে সারা আকাশের বাতাস—যাদের শির উঁচু, বাহু সমর্থ, চরণে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা! তাই সেদিন বাংলার যা, বাঙালীর যা, সব বিলিতি মাপকাঠিতে না মাপ্‌লে আর চল্‌ল না—বিলিতি তর্‌জমায় না দাঁড় করাতে পারলে আর মন উঠ্‌ল না। সেদিন মাইকেল হলেন মিল্টন—বঙ্কিম হলেন স্কট্—রবীন্দ্রনাথ হলেন শেলী। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে এই যে মাইকেলও মিল্টন নন বা শেলীও রবীন্দ্রনাথ নন্।

তারপর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তোমাদের ঐ বাংলা দেশটাতে হঠাৎ একটা কি হয়ে গেল তাকে ভেল্কিই বল আর ভোজবাজিই বল আর miracleই বল—রাতারাতি একেবারে সব বদ্‌লে গেল। সমাজে মহাত্মা যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সাধনা ভিতরে ভিতরে চল্‌ছিলই,—সে সাধনার ফল ভিতরে ভিতরে জমা হয়ে উঠ্‌ছিলই—জাতির অন্তরে অন্তরে কোথায় কোন্ গুপ্ত শক্তি সবার অলক্ষ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে মর্‌ছিল—তাকে অতি সোজা স্পষ্টভাবে আঘাত কর্‌বামাত্র তা একেবারে সহস্রফণা অনন্ত নাগের মতো গর্জ্জে' উঠ্‌ল। তা দেখে আঘাত করেছিলেন যাঁরা তাঁরা ত অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হলেনই,—সারা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত

বিস্মিত হয়ে গেল—বাঙালী নিজেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত না হয়ে পার্‌ল না।

সেদিন থেকে সব উল্টে যেতে স্থরু কর্‌ল। পশ্চিম দিক্-চক্রবালে নিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরে এসে পূর্ব্বাচলের ওপরে স্থাপিত হ'ল—আবিষ্কার কর্‌লুম পশ্চিম দিকচক্রবালের ওপরের আকাশ যে ডোবা সূর্য্যের মাতলামিতে জবার মতো লাল হয়ে ওঠে তার চাইতে পূর্ব্বাচলের সোনার ভোরের সোনার আলোয় আমাদের জীবনের স্বপ্ন জীবনের আশীর্ব্বাদ বেশী জড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল—অক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের পরকে হিংসে করতে শিখিয়েছিল, শক্তি অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা ফিরে এল— বুঝ্‌লুম যে দেশী বটগাছটা যে মরে' যাচ্ছিল তার কারণ এ নয় যে তা বিলিতি ওকবৃক্ষ হয়ে উঠ্‌তে পারেনি—তার কারণ হচ্ছে এই যে তা মাটি থেকে আকাশ-বাতাস থেকে আপনার প্রচুর জীবনীশক্তি সংগ্রহ করতে পারেনি।

সে যা হোক্ মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, যে, ধীরে ধীরে জাতীয় মনটা কোট-প্যাণ্টালুন ছেড়ে ধুতি-চাদর পর্‌লে। তখন জান ত গুরুমারা বিদ্বে—একদিন আমরা যেমন দেশী যা-কিছু তারই বিলিতি তর্‌জমা করতুম— সেয়ানা হয়ে তেমনি আবার বিলিতি যা-কিছু তারই দেশী তর্‌জমা আরম্ভ করে' দিলুম। তাই দেশ passive resistanceএর তর্‌জমায় সত্যাগ্রহকে পেল। কিন্তু আগে যেমন বলেছি মাইকেল মিল্টন নন্ বা শেলী রবীন্দ্রনাথ নন্, তেমনি সত্যাগ্রহও passive resistance নয়। তুমি

প্রশ্ন তুল্‌বে কিসে নয়? ও-দুয়ের একই আরম্ভ একই সাধনা একই সিদ্ধি—তবে ও-দুয়ে কি প্রভেদ? বল্‌চি—শোন।

কর্ম্মক্ষেত্রে—practical fieldএ—ও-দুয়ের কি রকম চেহারা দাঁড়ায় সে-সম্বন্ধে আমার কোনোই মাথাব্যথা পড়ে যায়নি। আমি যে-কথাটা তোমাকে বল্‌তে চাই সেটা হচ্ছে এই, যে, ঐ যে passive resistance আর সত্যাগ্রহ ও-দুয়ের পিছনে দুটো বিভিন্ন রকমের মন আছে, দুটো বিভিন্ন রকমের মানস জগত আছে—ঐ দুটি শব্দের জন্ম হয়েছে দুটি বিভিন্ন রকমের—mental attitude থেকে। এবং যে কারণে ও-দুটোর জন্ম দুটো বিভিন্ন রকমের mental attitude থেকে সেই কারণে ও-দুয়ের মধ্যে একটা তফাৎ থাক্‌তে বাধ্য।

এ-তফাৎ সেই তফাৎ, যে-তফাৎ আছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে—ইয়োরোপে ও এশিয়ায়—ইংলণ্ডে ও ভারতে। এ-তফাৎ যে কি তা তোমায় আমি আঁক কষে' বা জ্যামিতির রম্বস্‌ বা রম্বাইড্‌ এঁকে বুঝিয়ে দিতে পার্‌ব না—তবে এ-সম্বন্ধে তোমার একটু ধারণা করিয়ে দেবার মতো একটা উদাহরণ আমার মনে এখন আস্‌ছে। এ-তফাৎ সেই তফাৎ যে-তফাৎ আছে ইয়োরোপের ও ভারতের দারিদ্র্যের চেহারায়। ইয়োরোপের দারিদ্র্য তার slumএ slumএ কদর্য্য হয়ে দেখা দেয়—আর ভারতের দারিদ্র্যের চেহারা পর্ণকুটীর আর প্রাঙ্গণে সুশ্রী তুলসীমঞ্চ। ইয়োরোপের মানুষ দরিদ্রতার মাঝে হয়ে ওঠে পশুর সামিল, ভারতের দরিদ্র তার দারিদ্র্যের মাঝে ভগবানের

দিকেই মুখ ফেরায়। তুমি হয়ত বল্‌বে সেদিন আর নেই—আজ এ দেশেও slum গড়ে উঠ্‌ছে। সত্যি—কিন্তু সে ইয়োরোপীয় সভ্যতার হাওয়ায় ও মুরুব্বিয়ানায়।

ইয়োরোপের শিরায় উপশিরায় জীবনের লাল সরাব চিন্‌চিন্‌ কর্‌ছে—তার নেশায় তার চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌ছে,—প্রাণ টন্‌টন্‌ করছে। এই রকম রাজসিক ইয়োরোপ যেখানেই দানব হয়ে উঠ্‌তে না পারে সেখানেই পশু হয়ে পড়্‌তে বাধ্য। সে যা হোক্‌, ওই রকম একটা ইয়োরোপের মনটা যে passive resistance বলে' একটা জিনিষ আবিষ্কার কর্‌ল সে passive resistanceএর "passive" অংশটা নাম মাত্র—ওর আসল অংশটা হচ্ছে "resistance"। passive resistanceএর passivityর পর্‌দা ভেদ ক'রে ইয়োরোপের রক্তজবা চোখ, তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের দৃঢ় পেশী দেখা যা'চ্ছেই। ইয়োরোপের সে রক্তজবা চোখ প্রশান্ত করবার বা সে মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রশস্ত কর্‌বার উপায় নেই—তা কর্‌তে হ'লে ইয়োরোপকে অন্ততঃ কয়েক শ বছর কঠোর তপস্যা কর্‌তে হবে তার প্রকৃতি বদ্‌লাবার জন্যে। অন্য দিকে সত্যাগ্রহের নাম শুন্‌লে কেমন যেন তার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আসে বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, চৈতন্যের প্রশান্ত মূর্ত্তি। যেখানে মিলিত হয়েছে অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে অসীম করুণা—আর সেই দুটোকে পরিয়ে দিয়েছে একটা অশ্রু-আকুল নিবিড় বেদনার সু-শুভ্র উত্তরীয়—যে বেদনা আপনার নিজের নয়—জগতের। দুঃখকেই চরম দান বলে' গ্রহণ কর্‌বার, বরণ

কর্‌বার, বহন কর্‌বার শক্তি ও আনন্দ আপনাকে সত্য করে' তুলেছে যেখানে সেইখানেই সত্যাগ্রহের সত্য আসন।'

সেই কারণেই তোমাকে এই কথাটা আমি বল্‌তে চাই যে ইয়োরোপের pa sive resistance দুর্ব্বলের বল হ'তে পারে, কিন্তু সত্যাগ্রহ নয়। আসলে ইয়োরোপ passive resistanceকে যে দুর্ব্বলের বল বলে সেটা হচ্ছে ইয়োরোপের মনে বলের যে ধারণা আছে সেই ধারণা থেকে—এবং সে ধারণা হিসেবে ইয়োরোপ ঠিক্। ইয়োরোপ শক্তিকে কেবল বাইরের দিক্ থেকেই দেখে। যত ভারী ভারী কামান, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সঙ্গীন—মিনিটে একশ'-কুড়ি বার ছুড়্‌তে পারে এমন রাইফেল—ঘণ্টায় দু' শ'-চল্লিশ মাইল যেতে পারে এমন এরোপ্লেন—অর্থাৎ মানুষের অন্তরের শক্তি বাইরে যে আকারে আপনাকে অনুবাদিত করেছে সেই বাইরের ওপরেই ইয়োরোপের বিশেষ দৃষ্টি। তাই ইয়োরোপের শক্তির শেষ কথা আজ ষোল ইঞ্চি কামান যা ত্রিশ মাইল দূরে মন-দশেক একটা শেল ফেলে পনের-কুড়ি ইঞ্চি পুরু একটা ইস্পাতের প্লেটকে অক্লেশে ভেদ করে যেতে পারে। ইয়োরোপের মনে এ-কথা সহজ ভাবে জেগে নেই যে মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাকে ঐ ষোল ইঞ্চি কামান ভেদ কর্‌তে পারেই না—যদি বা পারে তা আবার পরমুহূর্ত্তেই জোড়া লেগে যায়। পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুইয়ের সাঙ্গোপাঙ্গ ফ্রান্সে যা করেছিল, জার ও তার অনুচরেরা রাশিয়ায় যা করেছিল—অষ্ট্রীয়া ইটালীতে যা করেছিল —সার্ ও-

ডায়ার ও অ-সার ডায়ার সেদিন পাঞ্জাবে যা করল· তার পিছনে সর্ব্বত্র ইয়োরোপের ঐ বাইরেকার দৃষ্টি যে-দৃষ্টি ভাবে যে লোহার গোলা চালিয়ে মানুষের আত্মাকে জখম করা যায়—যে-দৃষ্টির ধারণা যে মানোয়ারী জাহাজের কামানের ছাপ্পান্ন ফুট্ লম্বা চোঙ্ মানুষের মনের চাইতে বড় ।

কিন্তু আমাদের ধারণা অন্য রকম। আমরা জানি বাহুবল বা পশুবলের স্থান ব্রহ্মবল বা আত্মবলের নীচে। ক্ষত্রিয় আমাদের দ্বিতীয় স্থানে। এই আত্মবলের কাছে বাহুবলকে পরাজয় মান্তেই হবে—তবে ধীরে ধীরে তিলে তিলে। এই সত্য সত্য বলেই আমাদের আশা—নইলে চারিদিকে তাকিয়ে যে জিনিষটা দেখ্‌বে সেটা হচ্ছে একটা কেবল অসম্ভবতার রাজ্য।

আমার ওপরের ওই কথা আমাদের old style philosophy বলে' ভ্রূকুঞ্চিৎ করে' থেকনা—কেননা আমি জানি যে তোমাদের নবীনের দলের আমাদের যা-কিছু পুরানো তাকেই উড়িয়ে দেবার দিকে একটা প্রচণ্ড ঝোঁক আছে। আমি অবশ্য সেটাকে অমঙ্গল বলে' মনে করিনে, কেননা যদি সমাজ বাস্তবিকই জীবন্ত হয়ে ওঠে তবে ঐ উড়িয়ে দেওয়াতে আমাদের পুরানো যা-কিছু সত্য তাকে সত্য করে' ফিরে পাবার সম্ভাবনাই বাড়বে। কারণ সত্যকে সত্যি সত্যি অভিনন্দিত কর্‌তে পারে সেই মন যে-মন মুক্ত। কিন্তু যে-মন কোনদিন সত্যকে বিচার কর্‌বার অবসর বা শক্তি পায়নি সে মন সত্যকে বহন কর্‌তে পারে বটে—কিন্তু সে চিনির বলদের মতো অর্থাৎ তাতে তার

দাসত্বই বাড়ে কিন্তু মোক্ষলাভ হয় না। সত্য জীবন্ত, যখন মন জীবন্ত। সেদিন কার মুখে শুন্‌লুম কে বল্‌ছিলেন যে পলিটিক্সে absolute wisdom বলে' কিছু নেই। পলিটিক্সে absolute wisdom বলে' কিছু আছে কি না জানিনে, কিন্তুএ-কথা ঠিক যে absolute truth-এরও কোন মূল্য থাকে না যখন তা এমন একটা মনের ওপরে এসে পড়ে যে-মনের হাঁ-নাও নেই নড়-চড়ও নেই। আবার অন্য একটা জিনিস দেখ। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে কিন্তু আমরা কবির যে লাইনটা রাতদিনই আওড়াই সে লাইনটার কবিত্ব যে কতখানি তা আর অবশেষে তেমন মনে লাগে না। তেমনি যে-সমস্ত সংস্কার জাতীয় মনের গায়ে অত্যন্তভাবে সংলগ্ন তাদেরও তেমন ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। এই কারণেই তোমাদের নবীনের দলের যে পুরানো যা-কিছু তা থেকে নিজেদের আল্‌গা করে' নেবার ঝোঁক সেটাকে আমি অমঙ্গলের মোটেও মনে করিনে। চাই কেবল সচলতা, জীবন্ত ভাব, স্বাধীন গতি। তারপর আর কোনো ভয় নেই। Blood must tell—রক্ত জলের চাইতে ঘনই—সরাবের চাইতেও। ঐ রকম আল্‌গা হয়ে গেলেই যে সবাই তোমরা একেবারে সাহেব হয়ে যাবে আর বাংলাদেশ একটা কালো ইংলণ্ডে পরিণত হবে এ যাঁরা মনে করেন তাঁদের মতো জ্ঞান আমার মগজে নেই। তবে এ কথা ঠিক যে তোমরা আর বশিষ্ঠ বাল্মীকিও হুবহু হয়ে উঠবে না। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে তোমরা ইংরাজি পড়েছ বা তোমাদের পুরোনো যা—কিছু সে—

সবেরই পিছনে একটা প্রকাণ্ড স্পষ্ট জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন দিয়ে দেখ্‌তে স্থরু করেছ। তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে সেটা ছিল ত্রেতাযুগ আর এটা হচ্ছে কলিকাল। যদি কেউ বলেন যে আমরা আর সংস্কৃত বাক্য কহি না, বাংলা কথা বলি, স্থতরাং সে যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঋষিদের বংশধরের দাবীর অধিকার আমরা হারিয়েছি—তবে সেটা কেমন হাসির কথা হয় বল ত? সে কালে আট বছরে মেয়ে বিয়ে দিত, এ কালে দিচ্ছে পনেরোয়, স্থতরাং তোমরা সব জাত হারিয়েছ; সে কালে "মটন" টারই চল ছিল, এ কালে মুর্গিটারও আমদানি হল,—স্থতরাং তোমরা সবাই ম্লেচ্ছ; সে কালে রাধাকৃষ্ণেরই গান গাওয়া হত, এ কালে সাগরের সঙ্গীতও লেখা চল্‌ল, স্থতরাং বাঙালীর বাঙালীত্ব আর রইল না;—এ-যুক্তিগুলিও ঠিক তেমনিই হাসির কথা। কারণ এ দুয়ের পিছনে একই মতলব। সেটা হচ্ছে মানুষের সমাজকে "তাসের রাজ্য" করে রাখা। কিন্তু সেটা অসম্ভব, কেননা স্বষ্টির তা মতলব নয়।

কিন্তু সে যাই হোক্, তাই বলে' আমি শক্তি সম্বন্ধে উপরে যা বলেছি তা যদি একেবারে উড়িয়ে দাও—তবে ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। তবে এই দাঁড়ায় যে মানুষের আত্মার চাইতে মন বড়, মানুষের মনের চাইতে তার হাতের পেশী বড়, সে পেশীর চাইতে তার কাঁধের বন্দুকটা বড়। তা যদি সত্যি হয় তবে কি ভীষণ অবস্থা মনে কর। তবে আজ যারা ইয়োরোপের মোটা মোটা চোখা চোখা পেরেক-বসান এমিউনিশান বুটের তলে

পড়ে আছে তাদের অনন্ত ভবিষ্যতেও কোন আশা নেই।' কিন্তু অশান্ত, সান্ত্বনার কথা এই যে তা সত্য নয়। কিন্তু তা যে সত্য নয় তা ইয়োরোপের race consciousness প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পারে না। তা যদি পার্‌ত তবে ইয়োরোপের ইতিহাসের ভিন্ন এক চেহারা আমরা দেখতে পেতুম বলে' অন্ততঃ আমার বিশ্বাস।

কিন্তু ভুল বুঝো না। আত্মবলকে আমি উঁচুতে স্থান দিচ্ছি বলে' বাহুবল যে কেবলই সয়তানের একটা কাণ্ড এ-ধারণা আমার নয়। কিন্তু সে কথা এখানে টেনে আন্‌ব না। টেনে আন্‌লে এ চিঠিখানা এম্‌নি জটিল হয়ে উঠ্‌বে যে তা তুমি মারাত্মক রকমের ভুল বুঝ্‌বে হয়ত। সে সম্বন্ধে তোমাকে একদিন বিশদ করে বল্‌ব যখন তোমাদের জ্ঞান আরও পাক্‌বে— অবশ্য যদি ততদিন বেঁচে থাকি।

অশান্ত, এইখানে আমি তোমাকে আমার একটা অনেক দিনের দেখা স্বপ্নের কথা বল্‌ব। সেটা হচ্ছে এই যে উইলিয়াম আর্চার সাহেব "Barbarian, barbarism, barbarous" বলে' চীৎকার করে' যতই গলা ভাঙুক না কেন এই ভারতই ক্রিশ্চিয়ান ইয়োরোপের চেঙ্গিজখানি সভ্যতাকে একটা জিনিস গ্রহণ করাবার অন্ততঃ চেষ্টা করবে যা সভ্যতার উঁচু স্তরের কথা—কেননা তা গভীরতর মানুষের কথা। ইয়োরোপের politics বল, commerce বল, industry বল, এর পিছনে আছে মানুষের বুভুক্ষু আত্মা। বল্‌ছি না যে সবারই বুদ্ধ হতে

হবে বা হওয়া সম্ভব, কিন্তু race consciousness বলে' একটা জিনিষ আছে। ইয়োরোপের এই race consciousness একেবারে মানুষের প্রথম পৃষ্ঠা—কিম্বা প্রথম পৃষ্ঠাও নয় তা একেবারে ছ'পেনী নভেলের রঙ-চ্যাব্ড়ানো মলাট। মানুষ-পুঁথির ভিতরের পৃষ্ঠাগুলো তার কাছে বন্ধই রয়ে গেছে। সে পৃষ্ঠাগুলো খুল্‌বার কথাও ইয়োরোপের মনে ওঠে না। যদি বা উঠে তবে তা commerce ও industryর কতটা সুবিধা বা অসুবিধা হবে তারই হিসেবে। অথচ ঐ বন্ধ পাতাগুলো মানুষকে খুল্‌তেই হবে—commerce industry বা সোনা-রূপোর হিসেব করে' নয়—মানুষের নিজের খাতিরেই, কেননা ঐ যে মানুষের সত্য। ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, বৃহৎ থেকে আরও বৃহতে মানুষকে যেতেই হবে—তবেই মানুষের সার্থকতা, তার আত্মার তৃপ্তি। মানুষের বুভুক্ষু আত্মার চিরন্তনের দাবী যে ইয়োরোপের কানে পৌঁছাচ্চে না তার কারণ জগতের হিংসা-কুটিল নয়নই, যে সে আজ দেখ্‌ছে—ইউরোপের বাহিরের সমস্ত অশক্ত পৃথিবী যে আজ ইয়োরোপকে ঈর্ষা কর্‌ছে। ইয়োরোপ আজ সমস্ত অশক্ত পৃথিবীর অন্তরে গুম্‌রে-মরা আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে' চলেছে।

কিন্তু এই কথাটা কোনোদিনও ভুলে যেও না যে যেমন গ্রহীতার মধ্যে যোগ্য অযোগ্য আছে—দানকারীর মধ্যেও তেম্‌নি যোগ্য অযোগ্য আছে। দান কর্‌বার অধিকার একমাত্র তারই যে শক্তিমান। পৃথিবীকে ভারত দান কর্‌তে পার্‌বে

তখনই যখন সে হবে শক্তিমান আত্মপ্রতিষ্ঠ। শক্তিমান কেবল ভিতরেই নয়—বাহিরেও। বড় বড় সহরে বড় বড় অট্টালিকা থেকে বেরিয়ে-আসা চক্‌চকে মোটরে যত বড় বড় লোকই দেখ না কেন, এটা মনে রেখ যে মনের জগতে অধিকাংশ লোকই যাকে বলে প্রাকৃত। তারা বাইরে খোলা চোখে স্পষ্ট না দেখ্‌লে কিছু মানে না। সেই জন্যেই বল্‌ছি যে শক্তিমান হ'তে হবে ভিতরে ও বাহিরে দুই-ই। কেননা, তুমি অনুমান কর্‌তে পার যার ঘরে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না বলে' সবার বিশ্বাস সে যদি পঞ্চমুখে উপবাসের মহিমা কীর্ত্তন সুরু করে' দেয় তবে সেটা শোনাবেই বা কেমন আর লোকের মনে ভাব তুল্‌বেই বা কেমন। কিন্তু যাক্ সে-সব—বল্‌ছিলুম সত্যাগ্রহের কথা।

বল্‌ছিলুম ইয়োরোপের শক্তির ধারণার কথা। ইয়োরোপের শক্তির ঐ ধারণার দিক্ থেকে সত্যাগ্রহ নিশ্চয়ই দুর্ব্বলের বল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইয়োরোপের শক্তির ধারণাকে মন থেকে খারিজ করে' দিয়ে শক্তিকে আমাদের ধারণার দিক থেকে দেখ্‌বে, তখনি দেখ্‌তে পাবে তা দুর্ব্বলের হাতের বল নয়—তা মন্ত্র হ'তে পারে একমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমানের। এ শক্তি কোন্ শক্তি? এ শক্তি দুঃখকে বহন কর্‌বার শক্তি। বড় সোজা কথা নয়—ভেবে দেখ—মানুষের সমস্ত—তার দেহ মন প্রাণ চিত্ত অহঙ্কার প্রতি মুহূর্ত্তে সজ্ঞানে অজ্ঞানে দুঃখকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে—যেখানে দুঃখ যেখানে কষ্ট সেখানেই তার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। তার মন প্রাণ দেহ সমস্ত তার দুঃখকে

বরণ কর্‌বার বিপক্ষে। এম্‌নি তার সহজ প্রকৃতি। মানুষ যতদিন তার এই সহজ প্রকৃতির ওপরে না উঠেছে ততদিন তার পক্ষে দুঃখকে বরণ করে' নেওয়া অসম্ভব—সত্যাগ্রহ তার হাতে হয়ে উঠ্‌বে দু'ধারী তলোয়ার—দু'দিক দিয়েই যাতে সে কাটা পড়্‌বে।

মানুষের কাঁধের বোঝা আর মনের বোঝা এ-দুয়ের ঠিক উল্টো নিয়ম। মানুষের কাঁধের বোঝাটা যত বড় তার ভারও তত বেশী। কিন্তু মানুষের মনের বোঝা সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যত বৃহৎ হতে থাকে তার ভারও তত লঘু হয়ে আস্‌তে থাকে। মনে নিজের বোঝা বওয়া সব চাইতে কঠিন। আত্মীয় স্বজনের বোঝা বওয়া তার চাইতে সোজা, দেশ বা সমাজের বোঝা বওয়া আরও সহজ, বিশ্বের বোঝা বওয়া তার চাইতেও সহজ। এর কারণ মানুষ যতই সঙ্কীর্ণতাকে তাড়াচ্ছে ততই সে আপনার ছোট আমিকে হারাচ্ছে—আর যা কিছু অশক্তি নিরানন্দ, তা ঘিরে আছে মানুষের এই ছোট আমিটিকে। আর এই ছোট আমিটিই হচ্ছে মানুষের সহজ প্রকৃতির দেবতা। যে দেবতা মনে করে যে সে-ই হচ্ছে এই বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রটা।

তাই এই কথাটাকে স্পষ্ট করে' মনে রেখ যে যতদিন মানুষ তার এই ছোট আমিটাকে তার সহজ প্রকৃতিকে অতিক্রম না করেছে ততদিন সে দুঃখের দানকে বরণ কর্‌বার সাহস বা বহন কর্‌বার শক্তি লাভ কর্‌বেই না। সত্যাগ্রহেও তার অনধিকার—এই অনধিকারে হাত দিলে উল্টো ফল হতে বাধ্য।

তাই আমরা দেখ্‌তে পেলুম পাঞ্জাবী কাণ্ড। সত্যাগ্রহের পিছনে এ-কথাটা ছিল না যে আমরা আমাদের সত্যকে সমস্ত মন প্রাণ আত্মার আগ্রহ দিয়ে আঁক্‌ড়ে থাক্‌ব আর বিপক্ষ শক্তি আমাদের দুধ ভাত খাইয়ে আমাদের সেই শক্তিকে পুষ্ট করবে। ঐ উপায়ে যে কোনো শক্তি পুষ্টিলাভ করে না সে-কথাটা এখানে নাই তুল্‌লুম। কিন্তু যে কথাটার সম্ভাবনাকে প্রায় নিশ্চয় জেনে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই যে বিপক্ষ শক্তি এই সত্যাগ্রহের শক্তিকে নত করবার জন্যে আমাদের মনের ওপরে প্রাণের ওপরে দেহের ওপরে কত প্রকার দুঃখকেই জমা করে' তুল্‌বে কিন্তু তবুও আমরা সেই সত্যকে বহন করবারই আনন্দে সে-সকল দুঃখকে বরণ করে' হিমাদ্রির মতো অচল অটল দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। তাতে উদ্দেশ্য সফল যদি নাও হত, অন্ততঃ সেই সত্যাগ্রহের আনন্দ থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌ত না—যে-আনন্দই হচ্ছে সকল অনুষ্ঠানের নগদ পাওনা। সত্যের এই রূপ আছে বলেই, এই আনন্দ দেবার ক্ষমতা আছে বলেই শিখ তার টিকির সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটাও দিতে ইতস্ততঃ করে না—এবং তার ভিতরেই সে অমৃত খুঁজে পায়। বিসর্জ্জনে বড় আনন্দ আছে বলেই তা বড়। নইলে কেবল নীতিশিক্ষা পড়ে' কে আত্মত্যাগ কর্‌ত?

কিন্তু বজ্র যখন পড়্‌ল তখন আমরা কি দেখ্‌লুম? দেখ্‌লুম, যে নিক্ষিপ্ত বজ্র একদিন ফিরে গিয়ে নিক্ষেপকারীকেই ভস্ম কর্‌বে, তা দিকে দিকে আগুন ধরিয়ে দিলে। মানুষ আঘাত যখন

পায় তখন আঘাতকারীকে তার সুদসুদ্ধ ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা না করা যে কত কঠিন! বিশেষতঃ সেই আঘাত যখন হয় কেবল অহঙ্কারের আঘাত।

বিরোধকে ক্ষমা দিয়ে ভূষিত করতে, ক্রোধকে অক্রোধ দিয়ে জয় করতে পারে কে? যে স্বর্গের দেবতা। অর্থাৎ যে আঘাতকারীর চাইতে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ। অন্যায়কে ক্ষমা করে' চলে কে? পথের বুভুক্ষু কুকুর। অর্থাৎ যার প্রকৃতই অন্যায়কে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ঐ দেবতা হবার মতো কোন্ শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা গিয়েছি? অন্যায়কে এতকাল আমরা কুকুরের মতোই বহন করে' এসেছি। হঠাৎ সেই অন্যায়কে যে আজ আমরা দেবতার মতো ক্ষমা দিয়ে বরণ করব তার জন্যে কোন্ সাধনা আমরা করেছি? কোন্ তপস্যার ভিতর দিয়ে আমরা গিয়েছি? দেবতা যখন আমরা প্রকৃতই নই তখন সেই দেবতার মতো সাজ পরে' রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলে যাত্রাদলের দেবতার মতো রাতজাগাই সার হবে, অথচ কোন দিক দিয়েই অমৃত মিলবে না—আর বিরোধ যখন কঠিন হয়ে উঠবে তখন সেই নকল দেবতার রঙ্ পরচুলো সব খসে' পড়বেই আর তখন বেরিয়ে প'ড়বে হয় সেই বুভুক্ষু কুকুরের করুণ কাতর আর্ত্তনাদ, নয় ক্রুদ্ধ মানুষের প্রলয়-হুঙ্কার। তাই আমরা দেখলুম পাঞ্জাবী কাণ্ড।

এইখানে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সবার চাইতে বড় প্রশ্নটা আসবে। সেটা হচ্ছে সত্যাগ্রহের সাফল্যের কথা। মানুষ শক্তিমান হয়ে

সেবতা হয়ে দুঃখের দানকে বরণ করে' নিক—নিয়ে তার মধ্যেই সে আনন্দ খুঁজে পাক—কিন্তু সত্যাগ্রহ কেবল সেইজন্যেই ত আরম্ভ করা হয়নি। এর পিছনে যে একটা ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। বিপক্ষশক্তি যদি দুঃখের মন্দার দিয়ে অশ্রুসাগর মন্থন আরম্ভ করে' দেয় তবে সেই মন্থনে সেই ঘর্ষণে যে ধূম যে অগ্নি নির্গত হবে যে হলাহল দিকে দিকে চারিয়ে যাবে সেই ধূমের মাঝে অগ্নির মাঝে হলাহলের মাঝে পরাজয় স্বীকার না করে' আত্মস্থ হয়ে অচল অটল দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই যে আমরা হাতে-হাতে আমাদের ঈপ্সিত লাভ কর্‌ব তার মানে কি? আজ যে কেবল দুঃখই দান করে' আনন্দের অট্টহাসি হাস্‌ছে কাল যে সে স্মিতহাস্যে বর দান কর্‌তে আস্‌বে তার নিশ্চয়তা কি? রুদ্র যেখানে তাণ্ডব নৃত্যে নেমেছেন—তাঁর বিরাট ঘনঘোর জটাজালে চন্দ্র সূর্য্য ঢাকা পড়েছে ডমরু ডিমি ডিমি বাজ্‌ছে—সহস্র ফণী করাল ফণা বিস্তার করে দিকে দিকে কালকূট ঝলকে ঝলকে উদ্গিরণ করে' দিচ্ছে সেখানেই যে আবার বরাভয়করা মাতৃরূপিণী রক্ষাকালীর আবির্ভাব হবে তার অর্থ কি? ঐ ফলাকাঙ্ক্ষা করেই না সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়েছিল? কিন্তু সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ঐ ফল যে ফল্‌বেই তার মানে কি? অশান্ত, তার মানে আছে, বল্‌ছি শোন।

সত্যাগ্রহকে আশ্রয় করে' কেবল দুঃখকেই বরণ করে' করে' চল্‌লে যে সত্য অধিকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে সেটা হচ্ছে

এই সৃষ্টির একটা নিগূঢ় কারণে—সৃষ্টির যে কারণটি পরিবর্ত্তন করবার ক্ষমতা কারো নেই। এই কারণটি হচ্ছে এই যে এই সৃষ্টির হাজার বিচিত্রতার অন্তরালে একটি অতি নিগূঢ় ঐক্যসূত্র আছে।

বলেছি সৃষ্টির সহস্র বিচিত্রতার অন্তরাল দিয়ে একটা ঐক্যসূত্র চলে গিয়েছে। এই বিচিত্রতা যত বিচিত্র, ঐ ঐক্যও তত সূক্ষ্ম, আবার বিচিত্রতা যত কম, ঐক্যও তত স্থূল। তাই মানুষ আর পাথরের মাঝে যে ঐক্য তা অতি সূক্ষ্ম অতি গুপ্ত অতি নিগূঢ়—মানুষ আর উদ্ভিদের মাঝে ঐক্য তার চাইতে কম সূক্ষ্ম—মানুষ আর পশুর মাঝে ঐক্য আবার তার চাইতে স্থূল—আবার মানুষ আর মানুষের মাঝে ঐক্য তার চাইতেও স্পষ্ট।

কিন্তু তবু মানুষে মানুষেও বিচিত্রতার অভাব নেই। এই বিচিত্রতা গড়েছে কতক তার অন্তর্প্রকৃতি, কতক তার বহির্প্রকৃতি। দেশভেদে কালভেদে সমাজভেদে ধর্ম্মভেদে বর্ণভেদে কর্ম্মভেদে মানুষে মানুষে এই বিচিত্রতা এই পার্থক্য পুষ্টিলাভ করেছে। কিন্তু ভিতরে বাহিরে এই সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের ভিতরকার সেই ঐক্যস্থানটি নষ্ট হয়ে যায়নি—সেটা কেবল গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে আছে। সত্যাগ্রহের সমস্ত দৃষ্টি সেই গুপ্ত স্থানটির প্রতি। তার লক্ষ্য সেই সুপ্ত স্থানটিকে আঘাত করে' জাগিয়ে তোলা। এ আঘাত বাইরের আঘাত নয়, অন্তরের আঘাত—অহঙ্কারের আঘাত নয়, দুঃখের আঘাত।

প্রত্যেক মানুষের নিগূঢ়তম অন্তরের এম্নি একটা মিলন-

বেদী আছে বলেই সত্যাগ্রহের সাধনা সম্ভব। বিশ্বমানবের অন্তরের ঐ মিলনবেদী আজ অন্ধকারে ঢাকা—প্রেমের দীপদানে দীপ জ্বালা হয়নি, প্রীতির ধূপদানিতে ধূপ দেওয়া হয়নি—পূজারি নেই মিলন-আরতি করে কে? মালী নেই মঙ্গল-কুসুম চয়ন করে কে?—কিন্তু তবুও সেই মিলন-বেদী একেবারেই পূজাহীন হয়ে পড়েনি, তাই তুমি আমি সবাই আজও আপন জনের দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠি।

কিন্তু আপন জনের দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌লেও সুদূর আরজেণ্টাইন রিপাব্‌লিকের মানুষের দুঃখে দুঃখ বোধ করিনে—কারণ আমি যে আমার মধ্যেকার মিলন-বেদীকে একটা অহঙ্কারের বিরাট কবচ দিয়ে ঘিরে রেখেছি—কেবল অহঙ্কারই নয়—ধর্ম্ম সংস্কার হাজার-রকম স্বার্থ convention ইত্যাদির ইট চূণ সুর্‌কির দেয়াল তার চারপাশে গেঁথে তুলেছি। তাই ইংরাজের দুঃখে ইংরেজ দুঃখ বোধ করে, কিন্তু কালা নেটিভের দুঃখে তার ঠোঁটে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে। সত্যাগ্রহের সাধনা সম্ভব কেননা সত্যাগ্রহের বিশ্বাস যে মানুষের ওই অহঙ্কারের কবচ যতই দুর্ভেদ্য হোক না কেন, তার চারপাশে ওই সংস্কারের দেয়াল যতই উঁচু হোক না কেন, তার আপনার অন্তরের অনুভূত দুঃখের উপর্য্যুপরি আঘাতে সে কবচ ছিন্ন করা যায়, সে দেয়াল বিদীর্ণ করা যায়। তখন সমস্ত কৃত্রিম আচ্ছাদনের অবসানে সত্য মানুষটি সত্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাবে। সেই অবস্থায় মানুষ মানুষের সত্য অধিকার নিজ

প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে বাধ্য—তখন অবিচারের অবসান হতেও বাধ্য।

আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি যে আমার এই কথাগুলো তোমার কাছে হেঁয়ালী-হেঁয়ালী ঠেক্‌ছে। সুতরাং এইখানে তোমায় আমাদের একটা অতি ঘরোয়া উদাহরণ দিচ্ছি যা আমাদের বাঙালী পরিবারে সদা-সর্ব্বদাই ঘটে থাকে।

ছোট্ট ছেলেটি মায়ের কাছে আব্‌দার ধরেছে। মা কিন্তু সে আব্‌দার রক্ষা করতে নারাজ। ছেলে ওম্‌নি মুখ ভার করে' বসে' রইল—খাবে না। মা ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে অনেক সাধ্য-সাধনা কর্‌লেন— কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন ছেলের আব্‌দার মঞ্জুর।

এখানে ব্যাপারটা কি হয়? ব্যাপারটা হয় এই যে সন্তানের না-খাবার যে দুঃখ তাই মাতৃমনে গিয়ে এমনি ভাবে আঘাত করে যে মাতার তা অস্বীকার করে' থাক্‌বার উপায়ই নেই। এ-ক্ষেত্রে এ-আঘাত অতি শীঘ্র অতি সহজে গিয়ে করে। কেননা সন্তানের সঙ্গে মাতৃমনের যে একত্ব তা অতি সহজ অতি স্পষ্ট। সন্তান যে ভিতরের ঐ কথাটা জেনে উপবাস-প্রতিজ্ঞা করে তা নয়। কিন্তু যে প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করে' তার অবশেষে জয়লাভ হয় সেটা হচ্ছে ঐ।

মা ও শিশুর মাঝে অন্তরালে অন্তরালে এই যে ব্যাপারটি সংঘটিত হয় সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠানেও ঠিক ঐ ব্যাপারটিই ঘট্‌বার আশা। অবশ্য অত সহজে বা অত শীঘ্র নয়। সত্যাগ্রহীর ওপরে

যতই নির্য্যাতন হবে ততই তার জয়লাভের সম্ভাবনাও বাড়্‌বে। নির্য্যাতনকারীর মধ্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও মানুষের অবশিষ্ট থাকে তবে ঐ নির্য্যাতনের দুঃখ তার অন্তরে প্রতিফলিত হয়ে একদিন-না-একদিন তার মাঝে তার পূর্ণ মানুষটিকে আসল মানুষটিকে বড় মানুষটিকে মিলনের মানুষটিকে জাগিয়ে তুল্‌বেই—তখন মানুষ মানুষের দুঃখ বুঝ্‌বে, মানুষ মানুষের অধিকার আপনার প্রাণে অনুভব কর্‌বে, তখন মানুষের ওপরে প্রভুত্বের অধিকার ত্যাগ করার দুঃখের চাইতে তাকে তার সত্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দুঃখ বড় হয়ে উঠ্‌বে—তখন আর মানুষকে তার সত্য-অধিকার লাভ কর্‌বার জন্যে শোণিতপাত কর্‌তে হবে না। এই হচ্ছে সত্যাগ্রহের ভিতরকার আসল জয়লাভের প্রণালীটি—অর্থাৎ তোমরা ইংরেজিতে যাকে বল্‌বে—How it should work out.

কিন্তু খেয়াল কর্‌বে আমি বলেছি যে "নির্য্যাতনকারীর মধ্যে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও মানুষের অবশিষ্ট থাকে—"; কিন্তু মনে কর যদি ইংরেজ জাতির মধ্যে প্রত্যেক মানুষটি এক একজন জেনারেল ডায়ার হয় তবে—? তবে সত্যাগ্রহের সফলতা সন্দেহজনক। কেননা জেনারেল ডায়ারের মতো মানুষের মধ্যেকার বড় মানুষটি এমনি মৃত যে জেনারেল ডায়ারের মৃত্যু না হ'লে আর তার জীবনলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। জানই শয়তানের কাছে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করা চলে না—আমাদের ভাষায় আছে, চোরা না শোনে ধর্ম্মের

কাহিনী। মানুষের দুঃখে ব্যাঘ্র ব্যথিত হয়ে উঠ্‌বে এই মনে করে' যদি তার সাম্‌নে আত্মবলিদানের জন্যে প্রস্তুত হও তবে তাতে বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য অতি সন্তুষ্টচিত্তে জিহ্বা কণ্ডূয়নই কর্‌বে—আর তার মনে যে ধর্ম্মভাব উঠ্‌বে সেটা ম্যাথু-কথিত সুসমাচার নয়। কিন্তু সুখের কথা এই যে ইংরেজ জাতিটার প্রত্যেক মানুষটিই এক-একজন জেনারেল ডায়ার নয়—এই আমার বিশ্বাস।

অনেক বকেছি এইখানেই আজ থাম্‌লুম। এক ঝাঁক পেয়ারা কুল ও ফুল কপি পাঠালুম প্রাপ্তিসংবাদ দেবে। ইতি

তোমার অতি প্রাচীন

ঠাকুরদাদা।

জুন ১৩, ১৯২০

দুষ্টু মিনি

অতঃপর তুমি আর অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমি তোমার স্বামী আর তুমি আমার স্ত্রী, কেননা একদা—এ অতি অল্পদিনকার পূর্ব্বের "একদা"—একদা এক শীতের সন্ধ্যায় গোধূলি লগনে কোন এক বিশেষ বিবাহসভায় আমি পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র রীতিমত আবৃত্তি করেছি, আর ঠিক সেই বিবাহসভাতেই—তুমি দুষ্টু মিনি—তোমার ফুলের মত ছোট্ট হাতটুকুকে আমার হাতের উপর দিয়েছিলে। তোমার হাতের সেই প্রথম স্পর্শ! জান কি হয়েছিল? তোমার কি হয়েছিল তা শোন বলছি—যদিও তুমি তোমার দুষ্টুমি মেশানো রাঙা ঠোঁট দুটিকে উল্‌টিয়ে ঘোরতর প্রতিবাদের স্বরে "কক্‌খনো না" বলে আমার কথার সত্যতাটাই প্রমাণ করবে। কিন্তু সে যাই হোক, বলছি শোন। সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দ তোমার আঙুলের ডগা দিয়ে এসে আমার কানে বাজ্‌ছিল, আর আমি স্পষ্ট দেখছিলুম, তোমার কপাল থেকে বুক পর্য্যন্ত একেবারে তোমার পরা-চেলীর মতই লাল হয়ে উঠেছে। আর আমার কি হয়েছিল জান?—আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, ঐ রকম আমার মন্ত্র-পড়া আর তোমার হাত রাখার পর এ কথাটা আর তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমি তোমার স্বামী আর তুমি আমার স্ত্রী, কেননা দশ জনের মতে স্বামীর স্বামীত্ব আর স্ত্রীর স্ত্রীত্ব লাভ করবার এ-ই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

তার পর ব্যাপারটা এসে ঐ খানেই কিন্তু শেষ হল না। কেননা তুমি যে এখন কেবলই আমার স্ত্রী তাই নয়—শাস্ত্রানুসারে তুমি আমার শিষ্যাও বটে। সুতরাং যখন তুমি আমার শিষ্যা ও আমি তোমার গুরু তখন তোমার আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল শিক্ষার ভার আমার। কাজেই যখন আমি তোমার গুরু ও ত্রিবিধ শিক্ষার ভার আমার তখন বলছি, এর পর থেকে তুমি আমার সকল উপদেশ মানবে ও সকল আদেশ পালন করবে। তোমার গুরু যে তোমার শিক্ষাসম্বন্ধে কতদূর উৎসাহী তা এখনই দেখবে। কেননা এই চিঠিতেই আমি তোমার শিক্ষা সুরু করে' দিচ্ছি। এখন আমার প্রথম উপদেশ শোন। আমার প্রথম উপদেশ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ছাত্রীজীবনের অনিলা, প্রমীলা, চপলা, সরলা ইত্যাদি প্রমুখ বন্ধুবর্গকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়ে 'কায়েনমনসাবাচা' উষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা থেকে উষা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র আমাকেই ভালবাসবে।

ঐটেই হচ্ছে আমার প্রথম উপদেশ ও প্রধান উপদেশ। ঐটে যদি তুমি একান্ত মনে জ্বলন্ত প্রাণে অবহিত চিত্তে সমাহিত

হৃদয়ে পালন করতে থাক তাহলে তোমার সকল্‌ অবহেলা ও অমনোযোগীতা চাই কি, উপেক্ষা করলেও করতে পারি।

এইখানে—তুমি যেমন দুষ্টু মিনি—আমি জানি প্রতিবাদের সুর তুল্‌বে। তুমি বলবে যে আমার ঐ উপদেশ একান্ত স্বার্থ-পরতা-দোষ-দুষ্ট। তোমার ঐ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার দুটি জবাব দাখিল করবার আছে। তা কর্‌ছি।—

আমার প্রথম জবাব এই যে, আমাকে তুমি প্রকারান্তরে স্বার্থপর বলেছ, তাতে আমি ভয় পাই নে। কেন না এই জগতে স্বার্থপর নয় কে ?

কথাটা শুনে তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়বে জানি। তুমি বলবে মানুষ সম্বন্ধে আমি নাস্তিক। সেই সত্যযুগের দধীচিমুনি থেকে এই কলিকালের নফর কুণ্ডু পর্য্যন্ত পরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলে, আর আমি বলছি কি না কোন্‌ লোকটা স্বার্থপর নয়! ঐ যে অমুক চাটুয্যে ধনের মায়া না করে কত কি বড় কীর্ত্তি করে গেল, ঐ যে অমুক মুখুয্যে প্রাণের মায়া না করে নৌকোডুবির সময়ে কত লোককে উদ্ধার করলে—এসব কি কিছুই না ?—

সত্যি, কিন্তু তুমি জান আমার চিরকালের ঝোঁক সমস্ত বিষয়ের পিছন থেকে একটা সাধারণ নিয়ম টেনে বের করবার, অর্থাৎ—প্রত্যেক গতির পিছন থেকে একটা common principle বের করা। জড় জগতে যে গতি ও স্থিতি তার পিছনে একটা principle আছে, এ কথা বৈজ্ঞানিকদের কাছ

থেকে শুনবে, ও—তিলের পিছনেও যা, তালের পিছনেও তাই। মনোজগতে যে চলা-ফেরা—তার পিছনেও সেই রকম একটা principle থাকাই সম্ভব। সুতরাং যখন সবাই কাউকে স্বার্থপর বলে ঈর্ষা করছে, ও আর কাউকে নিঃস্বার্থপর বলে বাহবা দিচ্ছে, তখন আমার চিরদিন কৌতূহল হয়েছে, এমন একটা কিছু বের করা—যা দিয়ে ঐ দুজনকেই ব্যাখ্যা করা যায়, যাতে করে দু'জনকে ব্যাখ্যা করতে দু'টো principle এর দরকার হয় না। সেই কৌতূহলের ফলে আমি অশেষ গবেষণার পর বিশেষ আবিষ্কার করেছি যে, স্বার্থপরতাটাই আসল জিনিস, নিঃস্বার্থপরতাটা একটা বাজে কথা, ওটা হচ্ছে ethical world-এর একটা নৈতিক বক্তৃতা—যা চোখ বুঁজে করা হয় ও মুখ বুঁজে শোনা হয়।

এত বড় একটা সাংঘাতিক কথা আমি বললুম আর তুমি অমনি তা গলাধঃকরণ করবে সে আশঙ্কা আমার নেই, সে আশঙ্কা নেই বলেই এমন একটা কথা তোমায় বলতে ভরসা পেলুম। কিন্তু ব্যস্ত হোয়ো না—এর লম্বা ব্যাখ্যাও আমি দাখিল করব। তারপর আমার বিশ্বাস তুমি দেখবে আমার এই কথা একেবারে pure truth, অর্থাৎ—নির্জ্জলা সত্য। আর ঐ সত্যটি যে তেমন সাংঘাতিক নয়, তারও আমি প্রমাণ দেব।

প্রথমেই আমি তোমাকে একটা অতি সোজা কথা ও অতি স্পষ্ট কথা বলছি। আমরা যে কাউকে স্বার্থপর ও কাউকে নিঃস্বার্থপর বলি তার কারণ, আমরা স্বার্থ জিনিসটার একটা

অতি সংকীর্ণ অর্থ দিয়ে বসেছি। এই সংকীর্ণ অর্থ দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের চর্ম্মচোখে স্পষ্ট দেখার প্রতিফল।

চর্ম্মচোখে স্পষ্ট দেখার একটা মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে, যেটা মানুষেয় চোখে পড়ে সেইটেকেই সে বাড়িয়ে তোলে— সেইটেকেই সে একটা অযথা বড় মূল্য দিয়ে বসে।

তাই, যে মানুষটা আপনার জন্য কোঠাবাড়ী বানাচ্ছে আর যে মানুষটি পরের জন্যে কুটীর তৈরি করে দিচ্ছে এদের একজনকে স্বার্থপর মনে করে সেলাম করে চলি আর একজনকে নিঃস্বার্থপর মনে করে পিঠ চাপড়ে বলি, "বহুৎ খুব"; কিন্তু ঐ দুজনার পৃথক কর্ম্ম motive এর অন্তরালে রয়েছে কিন্তু একটা জিনিস। সেই জিনিসটির নাম হচ্ছে—চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা জিনিসটাকে গোড়ার বিষয় করে যদি দেখ, তবে দেখবে, ও-দুয়েরই লক্ষ্য সুখ; তবে কেউ বা দেখে দেহের সুখ, কেউ বা খোঁজে মনের সুখ। এই যা প্রভেদ্। এইখানে একটা অত্যুত্তম রহস্যের কথা তোমায় বলি শোন। সাধু যে তার পক্ষে অসাধু হওয়া ঠিক ততটা দুঃখের কারণ, অসাধু যে, তার পক্ষে সাধু হওয়া যতটা। তেমনি মনের জগতে যে, তার পক্ষে দেহের জগতে এসে বাস করা ততটা অসুখের, দেহের জগতে যে, মনের জগতে গিয়ে বসে থাকা তার যতটা। সুতরাং ব্যাবহারিকক্ষেত্রে যার যে মূল্যই দাও না কেন প্রত্যেকের আসল স্বার্থ হচ্ছে তার স্বধর্ম্ম। এই স্বার্থকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, কেন না স্বধর্ম্মকে কেউ অতিক্রম করতে পারে

না। হয়ত তুমি প্রশ্ন তুলবে যে অসাধু যে সে কি চিরকাল অসাধু থেকেই যাবে? যে যা সে কি জীবনভর জন্ম জন্মান্তরে তাই-ই থেকে যাবে?—তা নয়। কেন না ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করা চলে; কিন্তু এ পরিবর্ত্তন করতে হলে চাই সাধনা। সাধনা অর্থ—পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ।

সে যাইহোক, উপরে আমার ঐ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে বলা যে, মানুষকে দেখতে হবে তার বাইরের বস্তুজগতের দিক থেকে নয়, তার অন্তরের মনোজগতের দিক থেকে; আর সেইটেই হচ্ছে সত্যিকারের দেখা। মানুষকে যারা বাইরের বস্তু দিয়ে পরিমাপ করতে চায় তারা হচ্ছে জড়বাদী কিন্তু যখন মানুষকে তার সত্যিকারের দিক থেকে দেখবে, অর্থাৎ—তার মনোজগতের দিক থেকে দেখবে, তখন দেখতে পাবে যে, ও—রাম রাবণের কীর্ত্তিকলাপের পিছনে একই principle, অর্থাৎ—একই ধর্ম্ম, আর সেটা হচ্ছে তাদের স্বধর্ম্ম। অবশ্য তুমি অযোধ্যায় বসে গভীর প্রাণের নিবিড় আবেগে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে পার কিন্তু একথা ভুলে যেয়ো না যে, তোমারই মত আর কেউ লঙ্কায় বসে রাবণসম্বন্ধে ঐ একই কথা একই সুরে ভাঁজতে পারে। জেনারেল ডায়ার সম্বন্ধে কি হচ্ছে তা ত জানই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মনের তৃপ্তি। তবে মনের এ তৃপ্তি কেউ পায় দশ হাজার টাকা কুড়িয়ে, কেউ ছড়িয়ে বা কেউ উড়িয়ে—এই যা প্রভেদ। এ প্রভেদ "ইতরে জনার" দিক থেকে খুবই বড় প্রভেদ সন্দেহ

নেই, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার দিক্ থেকে ও-তিনের একই উদ্দেশ্য, সে হচ্ছে বৈঠকখানায় হাল্‌কাভাবে যদি বল্‌তে হয় ত তবে বলি খেয়ালের চরিতার্থতা, আর তর্কসভায় গম্ভীর ভাষায় যদি বলতে হয় ত বলি স্বধর্ম্মের উদ্‌যাপন।

উপরে লক্ষ্য করবে আমি কখনো আত্মা কথাটার উল্লেখ করি নি। আমার দৌড় মন পর্য্যন্ত, মনোজগত পর্য্যন্ত। এই মনকেই বা মনোজগতকে তুমি টেনে বাড়িয়ে আত্মাতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পার, যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তবে আমি যে এতক্ষণ আত্মা কথাটাকে বাদ দিয়ে কথা বলেছি তার কারণ, ও-বস্তুটি আমার কাছে চিরদিনই গোলমেলে। ও-জিনিসটি আমার কাছে মনে হয় জ্যামিতির বিন্দুর মত। বিন্দু, অর্থাৎ— which has position but no magnitude, অর্থাৎ—যার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নেই, অর্থাৎ—আত্মা হচ্ছে অপরিমেয়। যে বস্তু অপরিমেয় সে বস্তুকে পাঁচ লাইনে দশবার করে উল্লেখ করতে আমার মন সরে না। বিশেষত উল্লেখ করলে আমার কেবলই মনে হত যে, আমি তোমাকে ধমক দিয়ে ঠিক রাখছি।

সে যাই হোক, মানুষকে তার এই অন্তরের দিকে থেকে দেখতে চাই নে বলে আমরা স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ এই দুটো কথার মধ্যে একটা আসমান জমিন গরমিল গড়ে তুলেছি। আমাদের এই জড় বুদ্ধিই এই বস্তু-জগতের উপরে মানুষের সকল সুখের উপাদান চাপিয়ে দিয়েছে। তাই সেই বস্তুজগতকে যখন কেউ

স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে তখনই আমরা মনে করে বসি যে, সে জীবনে সব সুখকেই পরিহার করেছে। আমরা তখন মোটেই মনে করতে পারি নে যে, দেহের বিলাসের চাইতে মনের বিলাস বড়। এবং যখনই যে দেহের বিলাস স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে তখনই জানবে যে সে মনের বিলাসের সন্ধান পেয়েছে বা সেই ফিকিরে আছে। তবে মনোজগতের স্বার্থকতার জন্যে মানুষ বস্তুজগতের অনেক দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যারা বস্তু আহরণ করে তাদেরই কি কম কষ্ট স্বীকার করতে দেখা গিয়েছে? অর্থের জন্য আত্মা বিক্রয় ত জগতে বিরল নয়। অর্থের জন্য আত্মা বিক্রয় করে' যদি মানুষ সুখ পায় তবে আইডিয়ার জন্য দেহের বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল দুঃখই পাবে এ-কথা দু'শতাব্দী আগেকার ইউরোপও বলবে না। বস্তুর নেশার চাইতে আইডিয়ার নেশা অনেক গুণ বড়। কেননা বস্তুর নেশা স্পর্শ করে' দেহকে, বড় জোর স্নায়ুমণ্ডলকে কিন্তু আইডিয়ার নেশা স্পর্শ করে মনকে আত্মাকে। সুতরাং বস্তুতে আছে দেহের সুখ, বড় জোর প্রাণের সুখ আর আইডিয়াতে আছে মনের সুখ আত্মার সুখ। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে' মান তবে এ-কথা ত তোমাকে মানতেই হবে যে, দেহের সুখের দিকে না তাকিয়ে যাঁরা মনের সুখের সন্ধানে ফিরছেন তাঁরাই বড় স্বার্থপর। আসল ভক্ত ত তাঁকেই বলি যনি বলতে পারেন, "কৃষ্ণধনে যেই ভজে সে বড় চতুর।" কৃষ্ণধন ভজা ভক্তের কাছে যতদিন এমনি স্বার্থের আকারে না দেখা দিয়েছে ততদিন

তাঁর সিদ্ধি নেই। তা শুধু কৃষ্ণভজাই বা কেন, দেশ-সেবা লোক-সেবা বা আর যে-কোন সেবাই হোক।

ভাল কথা, দেশ-সেবার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। যখন স্বদেশী রম্‌রমারম্ চল্‌ছিল তখন যখন শুনতুম যে, অমুকে কলমের এক আঁচড়ে হাজার টাকা মাইনের চাকুরী ছেড়ে দিলে দেশের কাজ করবার জন্য আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন শুনতুম কত লোকের উচ্ছসিত প্রকম্পিত বিকম্পিত কণ্ঠের বাহবা ধ্বনি—ওঃ কি স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন আমার মনে হ'ত লোকগুলো কি vulgar! যেন এরা কাম কাঞ্চনকেই জীবনের সার করে' বসে' আছে। যেন কাম কাঞ্চনের চাইতে মানুষের আর কোন বড় সুখের উপাদান নেই। এই যে মানুষের দেহকে বাড়িয়ে তোলা এর মধ্যে আছে একটা বিরাট অজ্ঞানতা। আর মানুষের এই দেহের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় চোখ রেখেই স্বার্থের সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সব মানুষই ত দেহাত্মবুদ্ধি নয়। যাঁরা অন্তরের জগতে আপনাকে টেনে তুলেছেন তাঁরা জীবনে সেই অন্তরের জগতের সূক্ষ্মতর সুখেরই আয়োজন করে' চলেছেন। এই দিক থেকে যখন ব্যাপারটা দেখবে তখন স্পষ্ট বুঝবে যে কেবল এক স্বার্থই আছে আর কিছু নেই।

যখনই দেখবে কোন মানুষ স্বেচ্ছায় বস্তুকে ত্যাগ করেছে তখনই জানবে যে, সে বিষয়কে বড় করে' পেয়েছে, অর্থাৎ—সে দেহের চাইতে মনকে বড় করে' প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন

দেহের ভোগই ভোগ, মনের ভোগ ভোগ নয়; দেহের সুখই সুখ, মনের সুখ সুখ নয় এ কথা আজ এই বিংশ শতাব্দীতে গরু গাধা ও মনে করবে না। তবে দৈহিক ভোগ আর মানসিক ভোগে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে। এক জনের দেহের সুখ আর এক জনের দেহে সংক্রামিত করে' দেওয়া যায় না, কিন্তু মন জিনিষটা সূক্ষ্ম বলে' এক দেহের সঙ্গে অন্য দেহের সম্বন্ধের চাইতে এক মনের সঙ্গে অন্য মনের সম্বন্ধ সহজ আর সেই জন্যে এক মনের সুখ অন্য মনে অতি সহজে চারিয়ে দেওয়া যায়।

আমার উপরের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনে তা সাংঘাতিক বলে' ঠিক করে' বসে থেক না। আমার ওই কথা প্রচার করলেই যে অমনি সবাই দেহাত্মবাদী হ'য়ে উঠবে এ কথা কস্মিন কালেও মনে করো না। আসলে ও-কথা যদি মনে কর তবে তার মানেই হবে এই যে, তোমার মতে মানুষ দেহের জগতকে বর্জ্জন করে কেবল নিঃস্বার্থপরতারূপ বাহবা লাভ করবার জন্যে। সুতরাং সেই "নিঃস্বার্থপর"-রূপ প্রশংসার অভাবে সবাই দেহকেই সার করে' বসে' থাকবে। কিন্তু তা নয়। এ কথা কোন দিনও মনে করো না যে, এ জগতে কতগুলো বোকা লোক চাটু বাক্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাদের দৈহিক আরাম সুখ সুবিধা ত্যাগ করেছে। মানুষের দেহকে প্রাণকে ডিঙিয়ে উপরের জগতের উঠার মধ্যে কোনরকম ঠকানো নেই নীতিবিদেরা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে গোঁফে তা দিতে দিতে মনে

করতে পারেন যে, বিশ্বমানব তাঁদের নৈতিক বক্তৃতার চোটেই মাথাটা কোনরকমে ঠিক রেখে চলেছে। কিন্তু আসলে তা নয়। দধীচি মুনিই হোক আর নফর কুণ্ডুই হোক এরা কেউ-ই নীতিগ্রন্থের পাতা থেকে নেমে আসেন নি তা আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি। মনে কর যদি কোন মিশনরী মহিলা গ্রিয়ার পার্কে তাঁর চিমৃটি-কাটা চশমাজোড়া নাকের ডগায় গুঁজে নিম্নলিখিত ষ্টাইলে বক্তৃতা সুরু করে দেন ঃ—

"হে জননীবৃণ্ড, আপনাডিগকে আজ আমি বলি যে, আপনারা আপনাডের সণ্টানডিগকে ষ্টন ডান করিবেন, পুত্র-কন্যাগণকে আপনি আহার না করিয়া পুষ্ট করিবেন তবে প্রভু যিশু আপনাডিগকে প্রেম করিবেন, আপনাডের স্বর্গের পঠ সুগম হইবে।"

এবং বাড়ী গিয়ে ভাবেন যে তাঁর বক্তৃতার চোটেই সব "জননীবৃণ্ড" "স্বর্গের পঠ সুগম" করবার জন্যই সন্তান লালন পালন করছেন তবে সেটা কেমন হাস্যাস্পদ হয় বল দেখি? নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ানোর মধ্যে মায়ের যে কত বড় সুখ আছে, সে সুখ সমস্ত নীতিগ্রন্থগুলোকে ভস্ম করে' কীর্ত্তিনাশার জলে ভাসিয়ে দিলেও লোপ পাবে না—যে সুখের আনন্দ সমস্ত নীতিবিদ্‌মণ্ডলীর চাইতে অমর অক্ষয়। এই আনন্দের লোপ হ'লে লক্ষ কোটি নীতি-বিশারদেরা মিলেও এই জগতকে রক্ষা করতে পারবে না।

এখানে আমি মা ও সন্তানের উদাহরণ দিয়েছি, কারণ ও-

ব্যাপারটা আমাদের কাছে এম্‌নি স্পষ্ট যে ও-সম্বন্ধে আর কেউ তর্কই তুলতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক ত্যাগের পিছনে তোমরা যাকে নিঃস্বার্থপরতা বল তার পিছনে ঠিক অম্‌নি একটা প্রক্রিয়া আছে—অম্‌নি একটা লাভ আছে। যে লাভ হচ্ছে একটা বৃহত্তর আনন্দ। সুতরাং মানুষ তার দেহের জগত থেকে মনের জগতে উঠবেই—পরের খাতিরে নয়, নিজের গরজেই। কারণ সেইটেই তার বড় স্বার্থ।

এইখানে তুমি নিশ্চয় একটা প্রশ্ন করবে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, ত্যাগই যদি বড় স্বার্থ হয়, দেহের জগত থেকে মনের জগতে ওঠাই যদি বৃহত্তর আনন্দ হয় তবে জগতের অধিকাংশ লোকই আপন আপন গণ্ডীতে সংকীর্ণ হ'য়ে আছে কেন—ওই সূত্র অনুসারে ত সবারই বুদ্ধ বা চৈতন্য হয়ে ওঠা উচিত ছিল, ও-পথ যদি অম্‌নি আনন্দদায়ক হয়?—তার উত্তর সোজা, এর উত্তরে আমি তোমায় প্রশ্ন করব যে, ভোগ অর্থ ই যদি সবার চাইতে বড় সুখ হয় তবে জগতের সবাই লক্ষপতি হয়ে ওঠে না কেন? এর উত্তরে তোমাকে বলতে হবে যে, কি করে' লক্ষপতি হ'তে হয় তা সবার জানা নেই, জানা থাকলেও তা অনেকেব করবার সামর্থ্য নেই, অর্থাৎ—তাদের অজ্ঞানতা ও শক্তির অভাব। তোমার প্রশ্নের উত্তরও ঠিক তাই। অজ্ঞানতা ও শক্তির অভাব। অধিকাংশ লোক এটা অনুভবই পান না যে দেহের বিলাসের চাইতে মনের বিলাস বড়। অনেকে অনুভব পেলেও সেখানকার

জগতে ওঠার মত শক্তি পায় না। আমি তোমার কাছে সংস্কৃত বচন আওড়াব না, নইলে তোমায় শুনিয়ে দিতুম—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—শক্তিহীনের অমৃতে অধিকার নেই—এ কথা অতি সত্য অতি সত্য অতি সত্য।

সে যাই হোক, মানুষকে যখন তার দেহের দিক থেকে, তার পশুত্বের দিক থেকে না দেখে তার বড় দিক থেকে তার পরিপূর্ণ রহস্যের দিক থেকে দেখবে তখন স্পষ্ট বুঝবে যে, ত্যাগ বলে' বিশ্বমানবেরই হোক বা ব্যক্তিবিশেষরই হোক কোন আইডিয়ালই নেই। কেননা যেখানে যে-কেউ স্ব-ইচ্ছায় কোন কিছু ত্যাগ করেছে সেখানেই জানবে যে সেই ত্যাগের পিছনে সে একটা কিছু, যা ত্যাগ করেছে তার চাইতে বড় লাভের সন্ধান পেয়েছে। কোন কোন স্থলে তোমার আমার মতে সেই "বড় লাভ" আসলে বড় লাভ হ'তে পারে কিন্তু সে লাভের হিসেব আছে নিশ্চয়ই। মানুষ শূন্যের জন্যে কোন দিন হাতের পাঁচ ছাড়ে না, যদি ছাড়ে তবে বুঝবে যে সেই শূন্যকে সে হাতের পাঁচের চাইতে বড় বলে' বসে' আছে। এই দিক থেকে দেখলে দেখবে যে, ত্যাগ বলে' কোন বস্তু নেই; সুতরাং নিঃস্বার্থপরতা বলে কোন আত্মিক অবস্থা নেই।

ও-সম্বন্ধে যে আমি তোমাকে আরও পাঁচ সাত পাতা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে না পারতুম তা নয়। কিন্তু এইখানেই থামলুম। কেননা তোমার অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার যে দুটি জবাব তার ঐ প্রথম জবাবটিই আমার প্রথম জবাব নয়।

আমার আসল জবাব হচ্ছে দ্বিতীয়টি। সুতরাং ওটার পিছনে ওইখানেই দাঁড়ি টেনে দ্বিতীয় জবাবটি তোমার কাছে দাখিল করছি।

আমার দ্বিতীয় জবাবটি হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে আমায় ঊষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার সন্ধ্যা থেকে ঊষা পর্য্যন্ত 'কায়েনমনসা বাচা' ভালবাসতে উপদেশ দিয়েছি সে কেবল আমার দু' চোখের পূরো দৃষ্টি তোমারই পূর্ণ স্বার্থের উপরে রেখে। আমাকে ভালবাসা তোমারই স্বার্থ। কেননা ভালবাসতে পারার চাইতে বড় সুখ বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই। সুতরাং তার চাইতে বড় স্বার্থও মানুষের আর কিছুতে নেই।

যে মানুষটির সঙ্গে তোমাকে সারা জীবন ধারে' বাস করিতে হবে তার সঙ্গে যদি তোমার একটা অবহেলার সম্বন্ধ হয়—কিংম্বা অবহেলার না হলেও কেবল সবার সঙ্গে যেমন সেই রকম একটা সহজ সাধারণ আটপৌরে সম্বন্ধ হয়, তবে তোমার জীবনটি কি ভীষণ একটা drudgery হ'য়ে উঠবে বল দেখি? মনে করতেও আমার প্রাণ শিউরে ওঠে। অপর পক্ষে যে মানুষটির কাছে তুমি থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার পাঁচটি মিনিটও হয়ত যাকে এড়িয়ে চলতে পারবে না, যে-মানুষটি, আমি নিশ্চয় করে' বলতে পারি, তোমার কাছে একটা প্রকাণ্ড দাবী নিয়ে হাজির হবে, সেই মানুষটীকে যদি তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পার তবে তোমার জীবনটি কি মধুময়ই না হয়ে উঠবে মনে কর দেখি? সে ভালবাসা যত নিবিড় তত গভীর হবে, জীবনের আনন্দ ও

তত নিবিড় তত গভীর হবে। কল্পনা কর দুটি অবস্থা। আমার সান্নিধ্যে তোমার দেহের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, আমার একটি কথায় তোমার সারা মন বিরক্তিতে ভরে' উঠবে —সে কি ভীষণ। এর চাইতে বড় শাস্তি তোমার আর কি আছে? কিন্তু আবার দেখ অন্য অবস্থা। কল্পনা কর আমার একটি দৃষ্টি-সম্পাতে তোমার গণ্ডে গ্রীবায় গোলাপে গোলাপময় হ'য়ে যাবে, আমার একটুকু স্পর্শের আভাসে সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র বিদ্যুৎ চারিয়ে যাবে—একটুকু আদরে মনে হবে —কি মনে হবে?—হয়ত মনে হবে তোমার সমস্ত মন প্রাণ যেন কোন্ এক অতি সুখের মৃত্যু দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে দূর থেকে দূরে আরও দূরে আরও দূরে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম হ'য়ে আরও সূক্ষ্ম—আরও সূক্ষ্ম—যেন কি একটা পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে একটা পরম শান্তির মধ্যে তন্দ্রার আবেশের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। মিনি, স্বর্গে কি এর চাইতে বেশি আর কিছু আছে? বিশ্বাস না হয়, যখন সেখানে যাবে নোট্ মিলিয়ে দেখো। কিন্তু এই মর্ত্ত্যে ঐ স্বর্গের সন্ধান পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটা নিবিড় গভীর বিরাট প্রেমের অনুভূতি—মধুর প্রেমের অনুভূতি। সুতরাং এই সব নানান্ দিক দেখে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাকে ভালবাসা তোমার নিজেরই স্বার্থ—প্রকাণ্ড স্বার্থ —চরম স্বার্থ।

বিশেষত ভগবান যাকে যে-বস্তু দিয়েছেন তার পক্ষে সে বস্তুর চর্চ্চা না করা মহা পাপ! ভগবান নারী জাতিকে বিশেষ

করে’ দিয়েছেন হৃদয়; যেমন পুরুষ জাতিকে বিশেষ করে’ দিয়েছেন মস্তিস্ক। সুতরাং নারীজাতির পক্ষে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করা কেবল যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাই নয় আমার মনে হয় ঐ পথেই তাদের সত্যও লাভ হবে।

একাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা ছিল পুরুষের সভ্যতা। সে সভ্যতার মধ্যে নারী-জীবনের বা নারী-আত্মার কোন ছাপ ছিল না, যা ছিল সেটা নিতান্তই হসন্ত রকমের। ঐ যে মানুষের সভ্যতায় নারী এতকাল পর্য্যন্ত কোন ঠাঁই পায় নি, হয় ত তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুরুষের মস্তিষ্কের অনুশীলনের জন্যে একটা বাধা বিপত্তিহীন মুক্ত পথ উন্মুক্ত রাখা। মস্তিস্ক জিনিষটাই হচ্ছে নির্ম্মম; সুতরাং সেখান থেকে নারীকে দূরে রাখতেই হয়েছিল, নইলে হয়ত তারা পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু আজ চারিদিক দেখে শুনে বার বার যে কথাটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে, পুরুষের মস্তিষ্কের জন্যে যে সময় ধার্য্য ছিল তা শেষ হয়েছে। এইবার মানুষের যে সভ্যতার পত্তন হবে তা পুরুষের এক হাতে গড়বে না।—তা গড়বে পুরুষ নারীর দু’ হাতে। আজ জগতের সভ্যতায় মস্তিষ্কের একটুকুও কোনখানে কম্‌তি নেই, কম্‌তি আছে হৃদয়ের। নারীকে সেখানে সেই হৃদয়ের জোগান দিতে হবে।

আসলে নারীকে যে বিশ্ব-সভ্যতা গড়বার ভার হাতে নিতে হবে, সেই ভার হাতে নিয়ে যদি নারী পুরুষেরই কেবল একটা

দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আবির্ভূতা হন, তবে এ নূতন পুরোহিতের আবির্ভাবে যে মানুষের বৃহত্তর দিক থেকে কোন লাভ লোক-সান হবে তা মনে হয় না। কিন্তু সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয় বলেই আমার বিশ্বাস এবং বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটি চালও অর্থপূর্ণ বলেই আমি মনে করি। সুতরাং নারীকে আসতে হবে নিশ্চয়ই পুরুষের একটা নিকৃষ্ট সংস্করণরূপে নয়—আসতে হবে তাকে আপনার স্বতন্ত্র সত্ত্বা পৃথক ঐশ্বর্য্য নিয়ে, একটা কিছু নতুন সম্ভার নিয়ে, যে সম্ভার নারীরই বিশেষ আপনার। কাজেই যে সম্ভার নারীই বিশেষ করে' পরিপূর্ণ করে' দিতে পারে, সেটি হচ্ছে নারী-আত্মা, নারীর হৃদয়।

তবে আজ যে আমরা পাশ্চাত্যে নারীর পৌরুষভাব লক্ষ্য করছি, তার কারণ পুরুষের গড়া-সভ্যতার মাঝে তাকে আজ আপনার স্থান পুরুষের শত সহস্র বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে করে' নিতে হচ্ছে। সুতরাং আজ নারীকে সেখানে বাধ্য হ'য়ে পুরুষেরই গড়া-বর্ম্ম পরতে হয়েছে ও চর্ম্ম ধরতে হয়েছে। কিন্তু নারীর যদি পৃথক সত্ত্বা থাকে, সময়ের চাইতে সত্য যদি বড় হয় তবে নারীর একদিন প্রকাশ হবেই হবে, পুরুষের একটা অপৌরুষ সংস্করণরূপে নয়, একদিন প্রকাশ হবে নারী আপনার আত্মার আপনার অন্তর্প্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্যে, আপনার মহিমাময়ী মূর্ত্তি নিয়ে।

এবং আমার মনে হয় যে, বিশ্বমানবের সভ্যতায় পুরুষের মস্তিষ্ক যে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে নি, নারীর

হৃদয়ের আলোকে সেই সমস্যাগুলোর নিরাকরণ পরিষ্কাররূপে সহজ হ'য়ে উঠবে, নারীর সহজ অন্তর্প্রেরণা সে সমস্যাগুলোর সমাধানের পথ অতি সহজে খুঁজে পাবে। একমাত্র অন্তরের সম্পদে যে সম্পদশালী সেই বাইরের সম্পদ ত্যাগ করতে পারে। নারীর অন্তর বিশ্বমানবের সভ্যতার এক নূতন ভিত্তির রচনা করবে। সে ভিত্তি বস্তুজগতে নয়, অন্তর জগতে।

সুতরাং নারীর আপনার দিক থেকেই হোক বা বিশ্বের দিক থেকেই হোক—নারী-জাতির হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন করা অত্যন্ত লাভের।

কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভীষণ বিরক্ত হ'য়ে উঠেছ; নিশ্চয় তুমি মনে মনে ভাবছ যে, আমার এই প্রকাণ্ড যা'-তা' বক্তৃতা কোন একাডেমীর সামনে করা উচিত ছিল। এ বক্তৃতার ভার তোমার উপরে চাপাই কেন?

কিন্তু দুঃখু কোরো না। এর পরের বার যে পত্র লিখিব তাতে একেবারে "প্রিয়তমে" থেকে আরম্ভ করে' "একান্ত তোমারই" পর্য্যন্ত কেবল থাকবে তোমারই রূপ বর্ণনা আর গুণ অর্চ্চনা। আর তাতে থাকবে—

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি
সখি জাগো সখি জাগো
মেলি' রাগ অলস আঁখি
সখি জাগো সখি জাগো।"

এমন কি যদি তেমন inspiration পাই, তবে বসন্তর

সঙ্গে প্রাণকান্তর মিল লাগিয়ে একটা মৌলিক কবিতাও রচনা করে' পাঠাতে পারি।

ইতিমধ্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন প্রতিসন্ধ্যায় পূবগগনে প্রথম তারাটি উঠার সঙ্গে আমারি বিরহে তোমার হৃদয়-তল ব্যথিত হ'য়ে ওঠে, তোমার কালো উজল চোক দুটো সজল হ'য়ে আসে—আর চাপা দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বুকটি ভরে যায়। ইতি

তোমার

স্বামী

জানুয়ারী ১, ১৯২১

জীবনকুমার

পুরোনো "প্রবাসী'র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা প্রবন্ধে তুমি এই কথাগুলো পেয়েছ—

"আজ আমরা দেশকে তুল্‌তে যাচ্ছি, নেশান গঠন কর্‌তে যাচ্ছি, যশহীন গৌরবহীন ঐশ্বর্য্যহীন এই হতভাগ্য দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি; কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল করে' তুল্‌তে চাইলে আগে সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে হবে। আর সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে চাইলে দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করে' তার অন্তরে এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর প্রেমকে জাগ্রত করে' তুল্‌তে হবে।"

এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, ঐ কথাগুলোয় আমি কি বুঝি? অর্থাৎ—তোমার ঐ প্রশ্নযুক্ত বাক্যের পরিষ্কার ভাব হচ্ছে, "ওর একটা বিশদ ও সরল ব্যাখ্যা করহ।"

তুমি যে প্রবন্ধটি থেকে ঐ লাইন ক'টি উদ্ধৃত করেছ সে প্রবন্ধটি যে-সময়টাতে "প্রবাসী"তে বেরয় সে-সময়টা আমার বেশ মনে আছে। কেননা ঐ প্রবন্ধটি বেরবার পরই বাঙলা-সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক হঠাৎ কি-রকম যেন-এক-রকম ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই ক্ষিপ্ত অবস্থার

প্রধান লক্ষণ ছিল তাঁদের নিজ নিজ হাতের কলমকে সত্যিকার সঙ্গীন বলে' ভুল করা। সে-অবস্থায় তাঁদের হাতের সেই সঙ্গীনটাকে, দু'চোখ বুঁজে এম্‌নি করে' তাঁরা চালিয়েছিলেন যেন তাঁরা ওয়াটার্লু যুদ্ধে Duke of Wellington-এর Tommies, সেই কস্‌রতে তাঁদের হাতের কলমরূপী সঙ্গীনের ডগা থেকে অজস্র মসি-কণা যে তাঁদের দু'গালে এসে উড়ে পড়েছিল তা তাঁদের চোখেই পড়ে নি। কেননা সেই ক্ষিপ্ত অবস্থায় তাঁদের মনের দর্পণে নিজের নিজের মুখ দেখবার কথা একবারও মনে ওঠে নি।

সে যাই হোক, এতে করে' একটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, কোন কোন বাঙালীর মনে এমন একটা জিনিসের এম্‌নি ভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে, সেটাকে একটা রিপু বলা চলে। সে-জিনিসটির নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌লে দ্বিতীয় রিপুটি সহজেই আবির্ভূত হন।

কিন্তু যাক সে কথা, তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ তখন ঐ লাইন ক'টির একটা ব্যাখ্যা তোমায় দিচ্ছি—আমি যেমন বুঝি। সে ব্যাখ্যাটা সরল হবে কি না তা বল্‌তে পারি নে, তবে সেটা বিশদ করবার দিকে একটা বিশেষ চেষ্টা আমার থাক্‌বে।

(২)

দেখ, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা আমার মনে বড়

লেগে আছে। সে-কথাটা হচ্ছে "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" এই কথাটা আমি খুব মানি, তবে ওর দু'টি পদ ছাড়া—ঐ যে ঐ "মহৎ কাজ"। ঐখানেই স্বামী বিবেকানন্দ exclusive হয়েছেন। আসলে মহৎ-ই হোক, ও অসৎ-ই হোক, কোন কাজটাই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। কেননা মহৎ কাজ ও অসৎ কাজ এ-দু'টোতে প্রকৃতিগত কোন তফাৎ নেই, অর্থাৎ—দু'টোই একই শ্রেণীর, অর্থাৎ—মহৎ কাজও যেমন অসাধারণ, অসৎ কাজও তেমনি সাধারণ নয়। ওর দু'টোর গায়েই সংসারের সেই সহজ জিনিসটির ছাপ নেই, যে জিনিসটির নাম হচ্ছে mediocrity, আসলে ও-দুটো হচ্ছে যমজ ভাই। এবং ও-দুটোর যে দু'রকম নাম দিয়ে রেখেছি তা কেবল ওদের চিনে নেবার সুবিধার জন্যে। কারণ আমাদের মতলব এই যে আমরা ওর একটার স্তবস্তুতি করব আর একটাকে গালাগালি দেব।

মহৎ অসৎ বা সং অসৎ-এর গা থেকে সুনীতি দুর্নীতি, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদি যত রকমের সভ্য-পোষাক আছে সব খুলে নিয়ে যদি সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে চেষ্টা কর তবে দেখবে যে, ওর পিছনে রয়েছে মানুষের আদিম মন, অর্থাৎ— Primitive mind অর্থাৎ—তার লাভ লোকসানের হিসেব, একেবারে সোজা আর ছাঁকা। বাড়ীতে ডাকাত পড়ে' যদি ডাকাতি করে' যায় তখন সেটা যে অত্যন্ত অসৎ কাজ, সেটা যে-কোন দেশের পিনাল কোড্ খুললেই দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু

"একদা যখন বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়," তখন সেটা যে খুবই মহৎ কাজ হয়েছিল এটা যে কোন স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত বাঙালীর কাছ থেকে শুন্‌তে পাবে। তবে লঙ্কাবাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয়ই তেমন মহৎ বলে' প্রতীয়মান হয় নি। যদি বা হ'য়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তাতে তাদের একটা বড় রকমের লাভ হয়েছিল জান্‌বে। জার্ম্মান ইম্পিরিয়েলিজম্ যে কতদূর অসৎ, তা ত আমরা সবাই জানি; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহত্ব কতদূর তাত আমাদের সবার কাছেই মান্য। তবেই দেখতে পাচ্ছ যে, মহৎ বা অসৎ, এ দুয়ের পিছনে রয়েছে একটা ব্যক্তিগত বা জাতিগত লাভালাভের হিসেব। এবং ঐ কারণেই একই প্রকৃতির কাজ সামাজিক হলে অসৎ হ'য়ে পড়ে, কিন্তু আন্তর্জাতিক হ'লেই মহৎ হ'য়ে ওঠে। কেননা আমাদের মন স্ব স্ব জাতির বাইরে গিয়ে দু' তিনটি জাতিকে সমষ্টি হিসেবে দেখতে পারে না। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া নিতান্তই ঝগড়া; কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে শৌর্য্য। সুতরাং বুঝতে পাচ্ছ যে, "মহৎ" ও "অসৎ-এ" যে তফাৎ সেটা বস্তুগত বা বিষয়গত নয়, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থাৎ—সেটা objective ততটা নয় যতটা subjective. আমার কথাগুলো তোমার কাছে স্পষ্ট হ'ল কি না তা জানি নে। কিন্তু না হোক্ ও দু-টোকে আর একটা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা যাক্।

তুমি জান, গেলযুদ্ধে জার্ম্মানদের সঙ্গীনের খোঁচা ইয়োরোপ

আমেরিকার অনেক অনেক ফিলজফারদের মাথার খুলিটা একটু একটু ফাঁক করে দিয়েছে, সেই অবস্থায় তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় হাওয়া লাগ্‌তেই তাঁরা জার্ম্মানদের সম্বন্ধে ভাবতে লেগে গেছেন। Harvard University-র প্রফেসর একটি Spanish ফিলজফারের একখানা বইয়ের দু'এক অধ্যায় সেদিন দেখেছিলুম। তাতে তিনি শোপেনাহার ও নিট্‌শে, এ দু জনের তুলনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, শোপেনহার ছিলেন Pessimist, আর নিট্‌শ-এ ছিলেন Optimist; তাতেই বোঝা যায় যে ও দুটি মানুষের ধাতু ছিল একই। Pessimism যেটা founded on reflection, সেইটেই Optimism, founded on courage হ'য়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ—একজনকে উল্টিয়ে দেখলেই আর একজনকে পাওয়া যায়। কেন না, the belief in a romantic chaos lends itself to pessimism, but it also lends itself to absolute self-assertion. এটাও ঐ Spanish ফিলজফারের কথা। চরমদুঃখই যে 'চরম' আনন্দ এ কথা যে-কোন দার্শনিক প্রেমিকের কাছ থেকে জান্‌তে পার্‌বে। Extremes meet, এটা যে কেবল একটা দার্শনিক মজার কথা তা নয়, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্যিকথাও।

উপরে আমার ঐ লম্বা বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্য তোমাকে বলা যে, "মহৎ" ও "অসৎ" এর ভিতরে আছে একটা অতি সূক্ষ্ম পরদামাত্র, আর সে পরদাও আমাদেরই মনের তৈরী,

আমাদের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি রেখেই। "মহৎ" ও "অসৎ" এ অম্‌নি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলেই অপকৃষ্টও উৎকৃষ্ট হ'তে পারে এক পলকে, কিন্তু ভাল থেকে উত্তম হওয়ার সাধনা অনেক কঠিন। লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যে hero-র বীজ যেমন তাজা অবস্থায় আছে, ভালমানুষের মধ্যে তেমন নেই। তাই আমার স্বামীজীর ঐ exclusiveness-এ আপত্তি। তাই বল্‌ছি যে মহৎ-ই হোক্ বা অসৎ-ই হোক, এ দুয়ের কোন কাজই চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, চালাকি কথার অর্থটা কি?—চালাকির অর্থ আমি যা করেছি তা তোমায় বল্‌ছি—অবশ্য আমি ওর অর্থটা করেছি ইংরেজীতে। ও-বস্তুর মূলে আছে মানুষের superficial impelse—ওর বাঙলা কর্‌লে এই দাঁড়ায়, ও হচ্ছে মানুষের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের একটা হাল্‌কা রকমের খেয়াল।

মানব সমাজ-সমষ্টির সত্যটা যে কি তা এখনও আমাদের চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। সমাজ দেশ জাতি ধর্ম্মের মধ্যে যে এত হিংসা দ্বেষ মারামারি কাটাকাটি চলেছে সে সমস্তের তলে চাপা পড়ে' রয়েছে যে একটা প্রেমের বা প্রীতির সম্বন্ধ যেটা মানবসমাজের আসল সত্য, এ কথাটা মনে কর্‌তে আমরা সবাই ভালবাসি। এই সম্বন্ধটাকেই সত্যকরে' তুল্‌বার একটা চেষ্টাও যে শক্তিশালী জাতিদের মধ্য থেকেও কারো কারো দ্বারা আরম্ভ হয়েছে তাও আমরা দেখ্‌ছি ও শুন্‌ছি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে জিনিসটা বিশ্বমানবের মধ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ

হ'য়ে আছে সে জিনিসটির নাম হচ্ছে—নামটি অতি পুরাতন ও ইংরেজীতে struggle for existence—যেটার বাঙলা আমরা করেছি জীবন-সংগ্রাম।

এই যে জীবন-সংগ্রাম, এই যে struggle for existence, এ জিনিসটি বর্ত্তমানে এমনি সত্য হ'য়ে উঠেছে যে যেখানে দে্খবে কোন struggle নেই সেখানেই জান্‌বে কোন existence-ও নেই—অবশ্য existence কথাটা এখানে আমি তার বিশিষ্টার্থে ব্যবহার কর্‌ছি, অর্থাৎ—কেবল বেঁচে থাকা নয়, আপনাকে নিত্য নব নব রূপে সৃষ্টি করে' চলার অর্থে।

উপরে যা বললুম তার প্রকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছি আমরা।

আমাদের মধ্যে যে struggle নেই, অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না, তা আর সব জাতির মুখেই শুন্‌তে পাবে। তাদের মতে আমরা হচ্ছি শান্তিপ্রিয় জাত। আমরা যে এত শান্তিপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলুম তার কারণ, আমাদের মধ্যে এমন কোন একটা বিশিষ্ট সত্য স্পষ্ট হ'য়ে ছিল না, যাকে রূপ দেওয়ার একটা অদম্য প্রেরণা আমরা অনুভব করতুম, অর্থাৎ—বিশিষ্টার্থে আমাদের কোন existence, লোপ না পেলেও, অন্ততঃ সুপ্ত হ'য়ে ছিল—এক কথায়, আমাদের অন্তরাত্মা মৃত হয়ে উঠেছিল। তবু যে আমরা দেহ নিয়ে বেঁচে ছিলুম সেটা নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মের জোরে এবং পরের কৃপায়। কেননা আমরা নিজের কাছে নিজে যত শূন্য হ'য়ে পড়েছি পরের কাছে আমাদের মূল্য তত বেড়ে গিয়েছে। একের পর প্রত্যেক শূন্যের মূল্য যে দশগুণ

এ ত স্কুলের ছেলেরাও জানে। নিজের কাজে আমরা যখন অকর্ম্মা হ'য়ে উঠেছি পরের হাতে তখনই আমরা সকর্ম্মক হ'য়ে উঠেছি। এটা খুবই স্বাভাবিক। বেকার লোককেই বেগার খাটান সুবিধা, এটা বোকাও বোঝে।

কিন্তু আমরা যে শান্তিপ্রিয়, সেটা আজ কাল আর তেমন জোর করে' বলা চলে না। কেন না আমাদের মধ্যেও struggle দেখা দিয়েছে। তার মানে, আমরা আমাদের existence-কে সত্য করে' positive করে' লাভ করেছি—আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা পৃথক সত্ত্বা অস্পষ্ট হ'লেও দেখা দিয়েছে—এবং সে সত্ত্বাকে ফুটিয়ে তোলবার সেটাকে বাইরের জগতে সাহিত্যে কাব্যে কথায় রাজনীতিতে সমাজনীতিতে মূর্ত্ত করে' তোলবার একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা আমরা আজ অনুভব করছি। তাই আজ আমরা পলিটিক্সে নেমেছি। যে বাধা আমাদের বাহিরটা জুড়ে বসে' আছে সেই বাধাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আমরা আজ বলছি, "হে ইংরেজ, যতদিন আমরা শূন্য পাত্র ছিলুম ততদিন সেখানে তুমি তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য-কলা, তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য, তোমার কোট-প্যাণ্ট, চা-চুরুট, টেবিল-চেয়ার দিয়ে সাজিয়েছ তাতে আমাদের কিছু আসে যায় নি; কিন্তু আজ আর আমরা শূন্য নই, আমাদের অন্তরাত্মা আজ সাড়া দিয়েছে তার পিছনের হাজার পাঁচেক বৎসরে সাধনা অভিজ্ঞতা জ্ঞান নিয়ে। আজ আমাদের মনে একটা প্ল্যান জেগে উঠেছে। সেই প্ল্যান আঁকতে আমাদের জায়গা চাই, তাতে রং ফলাতে

আমাদের আলো চাই বাতাস চাই। আজ তোমার রাজনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান কাব্য-কলা, তোমার হ্যাট্-কোট টেবিল-চেয়ার যে আমাদের সব জায়গাখানি জুড়ে বসে' আছে তাতে আমাদের আজ ভীষণ আসে যাচ্ছে। সুতরাং সে সব সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের নিজেদের মনের প্ল্যানকে মূর্ত্ত করব সফল করব। কেননা দুটো জিনিস যে একই জায়গা অধিকার করে থাকতে পারে না তা বহু বহু আগে ইউক্লিড বলে' গেছেন এবং সেটা এ পর্য্যন্ত অপ্রমাণিত হয় নি।" এই হচ্ছে আমাদের পলিটিক্সের ভিতরের কথাটা। পলিটিক্যাল ভাষায় একেই বলি আমরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

Fact-হিসেবে দেখ্‌ছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কায় আমাদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার অহঙ্কারের স্পর্শে আমাদের জাতীয় অহঙ্কার প্রাণ পেয়েছে। অবশ্য আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে না এলে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আজ জাগ্‌ত না। ও-কথা মনে করায় আমাদের অনেকেরই প্যাট্রিয়টিক্ অহঙ্কারে আঘাত লাগে। তবে এটুকু বোধ হয় আমরা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারি যে, এযুগে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাবার পাশ্চাত্য সভ্যতাই হচ্ছে নিমিত্ত। ইংরেজী কাব্য ইতিহাস ও ইংরেজের বুটের গুঁতো—এ দুই-ই আমাদের মন ও দেহকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করছে আত্মবশ হবার জন্যে।

কিন্তু যে বস্তুটির আমরা একচেটে ব্যবসা করি, অর্থাৎ—আধ্যাত্মিকতা, যার মানে আমাদের সবারই মতে আমাদের আত্মার নির্গুণ অবস্থা, হয় ত সেই আধ্যাত্মিকতার গুণে ইংরেজি কাব্য ইতিহাস আমাদের আত্মাকে যতটা উদ্বুদ্ধ না করেছে ইংরেজের বুটের গুঁতো আমাদের দেহকে তার চাইতে ঢের বেশী উত্তেজিত করেছে। বিলিতি কাব্য ইতিহাস আমাদের মনে দাগ কেটেছে, বিলিতি বুট আমাদের গায়ে তার চাইতে অনেক স্পষ্ট ও অনেক গভীর দাগ কেটেছে।

এর প্রমাণ পাচ্ছি আজ আমরা আমাদের পালিটিক্সে, যা আজ আমরা মনে প্রাণে করছি। আমাদের পলিটিক্স আমি দেখ্‌ছি একটা চালাকির খেলা, অর্থাৎ—জাতীয় বুদ্ধির একটা superficial impulse. এ কথায় আমি কি বল্‌তে চাই তা তোমায় বল্‌ছি।

যে সব দেশে রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বিদেশী নয় সে সব দেশে রাজনীতি ও সমাজনীতি আলাদা নয়। সে সব দেশে একটা আর একটারই ফল। ব্যষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে জড়িয়ে গড়ে' ওঠে সমাজনীতি, আর সমষ্টি ও সমষ্টি, জাতি ও জাতি, এক দেশ ও আর এক দেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে নিয়ে গড়ে' উঠেছে রাজনীতি বা পলিটিক্স। কিম্বা এক জাতির মধ্যেই ব্যষ্টির প্রতিদিনকার জীবন যাত্রার হিসেব হচ্ছে সমাজনীতিতে, আর সমষ্টির সাম্বৎসরিক জীবনযাত্রার হিসেব হচ্ছে রাজনীতিতে। অথবা প্রতিটি ব্যক্তি প্রত্যেকদিন

যা করেন তাই হচ্ছে সমাজনীতি আর রাজা বা গভর্ণমেণ্ট বৎসর ধরে' যা করেন তাই হচ্ছে রাজনীতি বা পলিটিক্স। যে দিক থেকেই দেখ না কেন, দেখ্‌বে একটা আর একটা থেকে বিচ্ছিন্ন ত নয়ই, বরং একটা আর একটার বৃহত্তর রূপ—রাজনীতিটা সমাজনীতিরই বৃহত্তর রূপ। এবং ঐটেই স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক অবস্থা সেইদিন থেকে আমাদের দেশে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌ল যে দিন থেকে আমাদের রাজা এসে হ'ল বিদেশী। সেইদিন থেকে আমাদের সমাজনীতি দেশের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌ল। তখন থেকে ভিন্ন দেশ ভিন্ন সমাজ ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন সম্বন্ধই রইল না। ফলে ধীরে ধীরে আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে উঠ্‌লুম তখন আর জাহাজের খবর রাখ্‌বার আমাদের কোন প্রয়োজনই রইল না। তার ফলে ধীরে ধীরে রত্নগর্ভা সপ্তসিন্ধু আমাদের কাছে জাতমারা কালাপানি হ'য়ে উঠ্‌ল। বাহির আমাদের কাছে যত সংকীর্ণ হ'য়ে আস্‌তে লাগল আমরা ততই আধ্যাত্মিক হ'য়ে উঠতে লাগলুম। প্রাণ যখন আপনাকে চারিদিকে ছড়াবার জায়গা পেলে না, আত্মা তখন আমাদের বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল উর্দ্ধে আকাশ ফেড়ে আর অধে মাটী ফুঁড়ে।

কিন্তু আমাদের হাত পা চোক কানের যেমন একটা অনুপাত আছে এবং সে অনুপাতকে লঙ্ঘন ক'রে কিছু একটা যদি অতিলম্বা বা অতিবৃহৎ হ'য়ে ওঠে তবে সেটা যেমন বিশ্রী ও

অসুন্দর হ'য়ে পড়ে এবং চতুর্ভুজ বা লম্বকর্ণ হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা দাঁড়ায়, তেমনি দেহ ও আত্মার মধ্যে একটা অনুপাত আছে এবং সে অনুপাতের সামঞ্জস্যকে এড়িয়ে যদি ওর একটা একান্ত হয়ে দাঁড়ায় তবে তাও বিলক্ষণ বিশ্রী ও অসুন্দর হ'য়ে ওঠে। তাই আত্মার ঐ রকম অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আমরাও অসুন্দর হ'য়ে উঠেছি আমাদের মনে প্রাণে জীবনে। যদি বল, আমরা যে অসুন্দর তার প্রমাণ কোথায় পেলে?—তার উত্তর চোখ খুলে একবারে আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে সৌন্দর্য্যহীনতা।

সে যাই হোক্, মুসলমান গেল ইংরেজ এল; কিন্তু আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতির ছিন্নসূত্র আর জোড়া লাগল না। বরং আরও বিপরীত হয়ে উঠল। কেননা, মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য ছিল ধর্ম্মের, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হ'ল ধর্ম্মের ত বটেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বর্ণেরও। ওর ফলে আমাদের চতুর্বর্ণ লোপ পেয়ে আমরা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালুম দু'বর্ণে—শ্বেত আর কৃষ্ণে। আলো অন্ধকারের যোগ কবে সম্ভব হয়? সুতরাং এই আলো আর অন্ধকারের যোগ কোনকালে সম্ভব হ'ল না। ফলে ইংরেজের রাজনীতির হাওয়া আমাদের সমাজনীতির গায়ে লাগল না, আর আমাদের সমাজনীতির পবিত্র ধর্ম্মভাব ইংরেজের রাজনীতিকে কোট্-প্যাণ্ট্ ছাড়িয়ে ধুতি-চাদর ধরাতে পারল না। ফলে, আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা আশ্চর্য্য রকম গৌরবের হ'য়ে

উঠল ; আমাদের আত্মা' একটা বিরাট পুরুষ হ'য়ে সমস্ত জল স্থল আকাশ অধিকার করে' চিদ্‌ঘন নির্গুণ ব্রহ্মবৎ বিরাজ করতে লাগলেন ; কিন্তু আমাদের দেহের কোন খোঁজ খবরই রইল না যে, তা থাকল কি গেল।

এতে ফল হল এই যে, ইংরেজ দেখলে মহা বিপদ। সে ভারতের রাজা হ'য়ে বসেছে। রাজা হলে রাজ্যে প্রজা চাই। আমাদের যে-রকম ভাবে যে-দিকে গতি তাতে আমরা যে সবাই নিছক আত্মা হ'য়ে উবে যাব না তার নিশ্চয়তা কি ? তখন সে রাজ্য করবে কাকে নিয়ে ? মাটীর মূল্য না তখনই যখন তার উপরে মাটীর মানুষও থাকে। তাই ইংরেজ তখন স্থির করলে যে, সে আমাদের শিক্ষা দেবে তার ভাবে ও তার ভাষায়। কেননা, তার সাহিত্য হচ্ছে মাটীর ও মানুষের এবং মাটীর মানুষের গল্প দিয়ে ভরা। তার গানের ও গল্পের প্রধান সুর হচ্ছে মাটীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাব-ভাষা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ যশ-গৌরবের অনুপ্রেরণা দিয়ে মণ্ডিত ও অনুপ্রেরণা দিয়ে ঝঙ্কৃত, তার মনের কথা প্রাণের ব্যথা সব ইহজগতের আনন্দের স্পর্শে হিল্লোলিত উল্লসিত। তার ভরসা, যদি সে-কথার সে-ব্যথার চমৎকারিত্বে মোহিত হয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ততা কতকটা কেটে যায় এবং আমরা এই মাটীর 'পরে নেমে আসি আমাদের দেহ মন প্রাণ নিয়ে, তবে তার রাজ্যও থাকে রাজত্বও চলে।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে আমাদের মনের স্পর্শ ঘটলে আমাদের

আধ্যাত্মিক অবস্থার শুচিতা ও শুদ্ধতা আমরা হারিয়ে যাব এ মনে করে' আমাদের মধ্যে অনেকে সে শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন; কিন্তু দু'এক জনা এমন ছিলেন যাঁরা আত্মাকে মন প্রাণ দেহের নিতান্ত অনাত্মীয় বলে মনে করতেন না, তাঁরা বললেন, কুচ্ পরোয়া নেহি, আমরা ইংরাজি শিখব, ইংরাজের সাহিত্য পড়ব, তার ভাব ভাষায় আলোচনা করব। ফলে একদিকে গালাগালি আর একদিকে হাততালির মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

আমি আগেই বলেছি, ইংরেজী সাহিত্য হচ্ছে মাটী ও মানুষ এবং মাটীর মানুষের কথা। তার আশা আকাঙ্ক্ষার ছবি সেখানে আঁকা—আর সে এমনি মনোহর করে এম্‌নি চমৎকার করে, এম্‌নি একটা বৃহতের সুর তাতে মাখান যে, তা মানুষের প্রাণে সোজা ও সহজ হ'য়ে পৌঁছে যায়। আমাদের আত্মিক অবস্থার যত উঁচু evolutionই হোক্ না কেন আমরা মানুষ ত বটে। তাই ইংরেজের কাব্য ইতিহাস আমাদের প্রাণে এম্‌নি একটা তরঙ্গ তুল্‌ল, এমনি একটা নিবিড় ব্যথা জগাল, এম্‌নি একটা বহুদিনের ভুলে-যাওয়া-খেলাধূলোর স্মৃতি জাগ্রত করে' তুল্‌ল যে, আমাদের চোখের কোণে অশ্রু ফুটে উঠল—মর্ম্মতল বাদলের ব্যথা-জড়িত সুখস্বপ্নে কি রকম ভরে'উঠল। আমরা সেদিন মনে মনে ভাবলুম, আত্মা জিনিষটা খুব ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু মানুষও ত কম নয়, তার মনের প্রাণের সুখ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা আকিঞ্চন, হাসি অশ্রুর

ভিতর দিয়ে যে এক দেবতা এসেছেন তিনি ত দীন নন্ হীন্ নন,—তিনি মুক্ত তাই বন্ধনে তাঁর ভয় নেই, তিনি ঐশ্বর্য্যবান, তাই অশ্রু তাঁর মুক্তো হ'য়ে ফুটে ওঠে, তিনি আনন্দময় তাই রিক্ততা তাঁর দৈন্যের মাপ-কাঠিতে মাপা চলে না। ওর ফল হ'ল এই যে আমরা আকাশ থেকে মাটীতে নেমে পড়লুম।)

মাটীতে নেমে আমাদের হ'ল মুস্কিল। এতদিন আমরা আত্মাকে দিব্যি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে নির্ব্বিবাদে বসে' ছিলুম, পৃথিবীতে নেমে দেখলুম যে সেখানে আমাদের পা রাখবার মত একটু জায়গা মিলতে পারে কিন্তু মাথা গুঁজবার মত কোন স্থান নেই। পৃথিবীকে আমরা এতদিন ছেড়ে ছিলুম, সেই অবসরে আর সবাই তাকে বেশ অধিকার করে' বসে' আছে। ইংরেজের পুঁথিতে পড়ে ছিলুম স্বাধীনতার কথা নিজ নিজ স্বত্বের কথা অধিকারের কথা। আমরা ইংরেজকে বললুম, আমরাও ত মাটীর মানুষ, সুতরাং মাটীর কিছু অংশ আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য। ইংরেজ হেসে বল্‌লে, "তোমরা মানুষ কে বল্‌লে, তোমরা ত সব আত্মার দল।" সেদিন থেকে ইংরেজের কাছে আমরা যে মানুষ তা প্রমাণ করতে বসে' গেলুম। হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট্ পরে' তার কাছে গিয়ে টুপিটি হেলিয়ে পা দুটো ফাঁক করে' বললুম এই দেখ আমারও মানুষ। ইংরেজ কি ভাবলে জানি নে কিন্তু জায়গা ছাড়লে না। সেদিন থেকে আমরা পলিটিক্স করতে লেগে গেলুম। আমরা বললুম, "হে ইংরাজ, তুমি আছ, কিন্তু আমিও আছি এটা তোমায় মান্‌তে হবে।" বহুদিন কেটে গেল, ক্রমে

ক্রমে আমরাও বল্‌তে শিখলুম, "হে ইংরেজ তুমি আছ কি নেই তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমার মাটী আমার দেশে আমিই আছি সবার প্রথমে।" স্বাধীনতার কথা আমাদের ঠোঁটে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল, আমরা বললুম, "স্বরাজ স্বরাজ।"

কিন্তু এই যে পলিটিক্স, এই যে স্বাধীনতার কথা, ও কেবল আমাদের ঠোঁটের আগে superficial-একটা চালাকি। এ স্বাধীনতা আমাদের অন্তরে অন্তরে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেনি, আমরা ইংরেজের শেখান বিদ্যার বুলি ঘাটে মাঠে বাটে ছড়াচ্ছি —কোথাও বা হুঙ্কার দিয়ে কোথাও বা গম্ভীর ভাবে। আমরা পুরো মানুষ এখনও হ'য়ে উঠি নি। কিসে বুঝি—তা বল্‌ছি।

আমি আগেই বলেছি, বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজার অধীনে আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাজনীতির সঙ্গে ততটা নেই যতটা আছে তার সমাজনীতির সঙ্গে। ইংরেজের রাজ্য-শাসনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রত্যক্ষ Contact যা আছে, তার একশ' গুণ আছে আমাদের সামাজিক শাসনের সঙ্গে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইংরেজের রাজনীতিতে যতটা আছে আমাদের সমাজনীতিতে তার চার ভাগের এক ভাগও নেই। অথচ আমাদের সমাজ সম্বন্ধে যেমন ভাব দশ দিন আগে ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু আমাদের চারিদিকে সমাজের সহস্র বন্ধন। মানুষ যাতে আপনাকে উদার করে' পায় মুক্ত করে' পায় তারই বিরুদ্ধে সমাজের যুদ্ধঘোষণা। আমরা যদি

সত্য সত্য মানুষ হ'য়ে উঠ্‌তুম, দাসত্বের শৃঙ্খল যদি সত্য সত্য আমাদের গুরুভার হ'য়ে উঠত, স্বাধীনতার সত্য আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য সত্য আমাদের আত্মায় জ্বলন্ত জীবন্ত জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠত তবে দেখতে, আমরা আজ আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতুম—কেননা সমাজের বন্ধনই আমাদের প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করে আছে। কারণ, মানুষের প্রথম জ্ঞান ব্যষ্টিত্বের, তারপর সমষ্টিত্বের বা জাতীয়ত্বের। তাই বলছি,আমাদের স্বাধীনতার জন্য হা হুতাশ আমাদের ঠোঁটের কথা, প্রানের কথা নয় আত্মার কথা নয়, অর্থাৎ—superficial তাই আমাদের রাজনৈতিক নেতা বা বক্তাদের মুখে রাজনীতির খৈ ফুটতে থাকে কিন্তু সমাজের দিকে কেউ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেই অমনি তাঁদের ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে ও গলা কাঠ হয়ে যায়।

ওর কারণ কি জান?—কারণ ইংরেজের ইতিহাস। ইংরেজের ইতিহাসে আমরা পড়েছি রাজায় প্রজায় যুদ্ধ। ইংরেজের সামাজিক জীবনে কোন দিনই সনাতনত্বের দানা বেঁধে উঠবার অবসর পায় নি। কাজেই সেখানে ইংরেজরূপী মানুষের কোন সংগ্রাম করবার দরকার হয় নি। ইংরেজের যুদ্ধ ছিল রাজার সঙ্গে। ইংরেজের পুঁথি পড়ে সেই একই জিনিস আমরা শিখেছি। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস যদি রাজায় প্রজায় যুদ্ধ না হ'য়ে ইংরেজদের সামাজিক জীবনের একটা ওলোট-পালোট হ'ত তবে দেখতে আজ আমরা রাজনৈতিক

প্ল্যাটফরম্ পুলপিট থেকে বাক্যবান বর্ষণ না করে' আমাদের সামাজিক আসরে নেমে অস্ত্র ধারণ করতুম। মানুষের মনের সাকার রূপ যে সমাজ এবং সমাজের বৃহত্তর রূপ যে রাষ্ট্র সেটা আমরা ভুলেছি। ইংরেজের রাজ্যশাসন প্রণালী ও ইংরেজী পলিটিক্সের পিছনে আছে ইংরেজের মন ও সমাজ। ঐখানে গিয়ে আমরা তাদের ভাষায় তাদের মনোভাব প্রকাশ করছি। ইংরেজ যে আমাদের সে সব কথা দু'কান পেতে শুনছে তার কারণ, সে বুঝছে যে সে সব তার নিজের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ওর ফলে আমরা ইংরেজী হ্যাট কোট পরা কোন স্বরাজ-লাভ করি আর যাই করি, দেখবে এমন একদিন আস্‌বে যখন ঐ স্বরাজ ভেঙে ফেলে আবার আমাদের নতুন করে' গড়তে হবেই। কেন না বিলিতি-স্বরাজের পিছনে আমাদের সামাজিক-মন নেই এবং তার পিছনে আমাদের ব্যষ্টির ধর্ম্ম নেই। সে-স্বরাজের পিছনে যা থাকবে সেটা হচ্ছে বিলিতি মন ও দেশী বুদ্ধি। এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।

(৩)

তোমায় কি বলতে গিয়ে কোথায় ভেসে গেলুম। এইবার ফির্‌ব। কেননা অনেক বকেছি। বলছিলুম স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথাটা—"চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধিত হয় না।" আর এই চালাকির অর্থ হচ্ছে superficial impulse—মানুষের বাইরেকার একটা আলগা প্রেরণা।

আমরা আমাদের দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত

করতে চাই এর মানে অবশ্য এ নয় যে, দেশের মাটী ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবশালী হ'য়ে উঠবে ;—তার মানে দেশের মানুষই সত্যি সত্যি উক্তরূপ বিশেষণে বিভূষিত হ'য়ে উঠবে। দেশকে মাতৃমূর্ত্তিতে গড়ে' সামাজিক জীবের মনে প্রাণে emotion জাগান সুবিধা হ'তে পারে এবং জীবন্মৃত জাতির পক্ষে যে সেটার একটা মস্ত দরকার তাও স্পষ্ট ; কিন্তু দেশ মানে যে মানুষ এ কথা political economy-র সময় মনে না রাখ্‌লে লাভের সম্ভাবনা দু'গণ্ডা রম্ভা। সুতরাং দাঁড়াল এই, দেশ ঐশ্বর্য্য সম্পদে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে, মানে দেশের লোকেরা ধন দৌলত অর্জ্জন ও উপার্জ্জন কর্‌বে, তার অর্থ সেটা তারা বর্জ্জন কর্‌বে না।

কিন্তু বৈরাগ্যের প্রধান ও প্রথম সূত্রই হচ্ছে ঐ সব অনিত্য বস্তুকে বর্জ্জন করে' চলা। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি দেশের ধন দৌলতের সঙ্গে মানুষের বৈরাগ্য-ভাবের কোনই সম্বন্ধ নেই—ওর একটা আর একটার ঘোর বিরোধী।

এখন মানুষ যদি ধন দৌলত যশ গৌরব অর্জ্জন কর্‌তে চায় তবে তার জন্যে তার চাই সত্য-আকাঙ্ক্ষা। এটার বোধ হয় বিশেষ ব্যাখ্যা তোমার কাছে দিতে হবে না। মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যে তার কর্ম্ম-প্রেরণার বিশেষ যোগ আছে সেটা ত সবার কাছেই স্পষ্ট। যে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের সত্য-আকাঙ্ক্ষা নেই সে বস্তু বা বিষয়ের জন্য মানুষের কর্ম্ম-প্রেরণা সত্যভাবে নিয়োজিত হ'তে পারে না। সত্য আকাঙ্ক্ষা বল্‌তে

আমি বুঝি, মানুষের আত্মাই বল বা তার deeper self-ই বল বা তার higher consciousness-ই বল তারই সত্য—এবং মানুষের জীবনে সেই সত্যই বিকশিত হ'তে হ'তে চলেছে—মানুষের চিন্তা কর্ম্ম ধর্ম্ম সেই সত্যেরই বর্ণে ও গন্ধে ফুটে উঠ্‌ছে—সেই সত্যেরই সুরে ও তালে বেজে উঠ্‌ছে—মানুষের জীবন সেই সত্যেরই একটা সাকার রূপ।

উপরের ঐ কথা যদি মান, তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশের লোকের আত্মায়, তার deeper self-এ যদি বৈরাগ্যই, অর্থাৎ—বিষয়-বিতৃষ্ণাই সত্য হ'য়ে থাকে তবে তার কর্ম্মপ্রেরণা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-গৌরবের সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করবে না—সে প্রচেষ্টা তখন তার হবে একটা superficial impulse—তাতে থাক্‌বে তার বেদনা, কেননা সেটা তখন তার স্বধর্ম্ম নয়—পরধর্ম্ম। এবং আমাদের পরধর্ম্ম অন্যের স্বধর্ম্মের কাছে পদে পদে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হ'তে বাধ্য। ভারতবাসীর অসত্য আকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ডবাসীর সত্য আকাঙ্ক্ষার সাম্‌নে যুগে যুগে মাথা নীচু করে' থাক্‌বে।

সুতরাং দেশবাসীদের সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করতে হবে এবং তাদের অন্তরাত্মায় বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে সত্য করে তুলতে হবে তবেই তাদের কর্ম্ম-প্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে, সেদিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে—কেননা অন্তরাত্মার যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ। আর তবেই তা সফল সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।

কেননা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সৃষ্টি সফল হ'য়ে আছে, তার কারণ, তা আনন্দে উৎসৃষ্ট হ'য়ে আনন্দ থেকেই আনন্দেই যাচ্ছে—সব কিছুরই আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই গতি। ঐ শেষের কথাটা উপনিষদের।

আমি উপরে যে লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লুম তা যদি না বোঝ তবে দোষ, হয় আমার কলমের, নয় তোমার মগজের।

বিলিতি মতে New Year's Greetings জানাচ্ছি, স্বদেশী ভাবে গ্রহণ কোরো। আশা করি এই ট্রাম ট্যাক্সি strike-এর মরসুমে তুমি খোস্ মেজাজে ও বহাল্ তবিয়তে বিরাজ করছ। ইতি—

তোমার

মৃত্যুঞ্জয়

বীরবল সাহেব

বহুদিন আপনার কোন খোঁজ না পেয়ে আপনার দৌলত-খানায় খবর নিতে গিয়েছিলুম,—হুরীদের মুখে শুন্‌লুম যে, আপনি মর্ত্ত্যে নেমে গেছেন এবং হিন্দুস্থানের রাজধানীতে মজলিস পাকিয়ে বসেছেন। ঐ সংবাদ শুনে আমি দিল্লীতে বহুদিন ধরে আপনার তল্লাস করেছিলুম ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। এমন সময়ে আপনার চিঠিখানা পেলুম কলিকাতা থেকে লেখা। তখন আমার ঘুম ভাঙল—সত্যি ত—ইংরেজ-হিন্দুস্থানের রাজধানী ত দিল্লী নয়,—কলিকাতা। তা দিল্লীর পিছনে যত কোটী টাকাই খরচ করা হোক না কেন। কলমের এক আঁচড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করা চলে কিন্তু রূপান্তরিত করা চলে না। দু'শ' আড়াই শ' বছরের অতীত দিয়ে ইংরেজ যে কলিকাতা গড়ে' তুলেছে তাকে রাতারাতি বাতিল করা চলে না—কেবল দিল্লীতে কতগুলো অট্টালিকা বসিয়ে। কলিকাতার পিছে রয়েছে কয় শতাব্দীর ইংরেজের মন আর দিল্লীর নীচে রয়েছে কয় বছরের ইংরেজী মুদ্রা। মন জিনিসটা যে মুদ্রার চাইতে বড় তা আপনি হিন্দু আপনার কাছে আর কি বলব। সুতরাং ইংরেজ-হিন্দুস্থানের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল, এই বাইরের বিজ্ঞাপনে যে ভুলেছিলুম তাতে আমি বিশেষ লজ্জিত।

আপনার কথা খুব ঠিক, ইংরেজ হিন্দুস্থানের ইতিহাস খুবই মজাদার ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ করে' হিন্দু-মুসলমানের স্বায়ত্ব-শাসন লাভের জন্য সংগ্রাম। আপনি একটা কথা বোধ হয় জান্‌তেন না যে, হিন্দুস্থান ইংরেজের দখলে আসবার সময় থেকেই আমি সেখানকার ইংরেজের রাজনীতি ও দেশবাসীর সমাজনীতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছি—কেননা "আইন-ঈ-আংরেজী" নাম দিয়ে ইংরেজ-হিন্দুস্থানের একখানা ইতিহাস আমার লেখবার ইচ্ছা আছে। এর থেকেই বুঝতে পার্‌ছেন যে, ও সুরে বাঙলার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-ই হোন বা গুজরাতের শ্রীযুক্ত মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী-ই হোন, কারোই কার্য্য ও কথা আমার চোখ কান এড়িয়ে যায় নি। কেননা একটা দেশের ইতিহাস মানে যে কতগুলো মানুষের ইতিহাস এ জ্ঞান আমি হারাই নি—আর কতগুলো মানুষের ইতিহাস মানে যে কয়েকটি মানুষের জীবন-চরিত এ জ্ঞানও আমার আছে। সুতরাং বুঝ্‌তেই পারছেন যে নন্-কো-অপারেশন ব্যাপারটার দিকে আমি বিশেষভাবেই চোখ কান খুলে' রেখেছি।

বর্ত্তমানে নন্-কো-অপারেশন মুভমেণ্টের সবার চাইতে Interesting ব্যাপার হয়ে উঠেছে কলিকাতায় ছাত্রদের ইস্কুল-কলেজ ত্যাগ। (এইখানে আপনাকে বলে রাখা ভাল যে, "আইনি-ঈ-আংরেজী" লিখিব বলে' আমি ইংরেজী ভাষাটাও কিছু কিছু আয়ত্ব করেছি এবং ইংরেজী সাহিত্যও কতক কতক

অধ্যয়ন করেছি) যাই হোক, বল্‌ছিলুম ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে নন্‌-কো-অপারেশন খুবই interesting হ'য়ে উঠেছে।

আগরাতে বাদ্‌শার খুশ্‌বাগে আমাদের দাবার আড্ডা বসত আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। তখন আমরা দেখতুম যে, যাঁরা দর্শক তাঁদের এমন কতগুলো চা'ল চোখে পড়্‌ত যা খেলোয়াড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। সুতরাং ঐ নন্‌-কো-অপারেশনের ভিড়ের বাইরে থেকে ছাত্রদের কথা ও কার্য্য কি রকম শুন্‌তে ও দেখতে লাগে তা আপনার কাছে বললে হয় ত নেহাৎ uninteresting হবে না।

যে জিনিসটি কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যায় না সেটি হচ্ছে ছাত্রদের ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দেবার suddenness. গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার স্পেশাল কংগ্রেসে নন্‌-কো-অপারেশন প্রস্তাব পেশ হয় ও পাশ হয়। তখন কলিকাতার ছেলেদের তা কানেও বাজে নি প্রাণেও বাজে নি। তারপর আলিগড় কলেজ ইসমালিয়া কলেজে গোলমাল বাধল। তখনও কলিকাতার ছাত্ররা নিতান্ত pessimist হ'য়ে চুপ করে ছিল। বাঙলায় গান্ধীজি এলেন ঘুরলেন ফিরলেন বক্তৃতা দিলেন চলে' গেলেন—কোন দিকে কিচ্ছু না। তারপর গত ডিসেম্বর মাসে আবার নন্‌-কো-অপারেশ প্রস্তাব পেশ হয় ও একটু উনিশ বিশ করে' পাশ হ'ল। তখনও কিছু না। তারপর ঐ সময়ে নাগপুরে Students' Conference-এও ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দেবার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হ'ল, তখনও কলিকাতার ছেলেদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য

দেখা গেল না। কিন্তু যেমনি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করলেন যে, তিনি ইংরেজের আদালতে আইনের মুন্সিগিরি আর করবেন না—অমনি কলিকাতা ব্যাপী হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। ছাত্ররা কতক ইস্কুল-কলেজ ছাড়্ল আর কতককে ছাড়াল। উদ্দীপনা উত্তেজনা আলোচনা বিলোচনা তর্ক বিতর্ক কুতর্ক আর সবার মাথার উপরকার নৈবেদ্য অনিবার্য্যবক্তৃতায় চারিদিক সরগরম হ'য়ে উঠ্‌ল। বক্তৃতা দেবার সুবর্ণ সুযোগ দেখে বক্তাদের মুখে আর হাসি ধরে না। অন্যান্য প্রদেশ থেকে বক্তারা ছুটে এল গলা শানিয়ে। এ ব্যাপারটা আমার কাছে কি রকম প্রতীয়মান হচ্ছে জানেন?—এটা ছাত্রদের নন্-কো-অপরেশনও নয়, পলিটিক্স করাও নয়,—এটা হচ্ছে তাদের ভক্তি-যোগ বা ভক্তিরোগ। রোগ বল্‌ছি এই জন্যে যে, যে-কোন বস্তুর আত্যন্তিক অবস্থাই রোগবিশেষ। সে যাই হোক্ বাঙালী জাতটা emotional, অর্থাৎ—ভাবপ্রবন, এটা আপনি জানেন। চিত্তরঞ্জনের ঐ স্বার্থত্যাগে তরুণপ্রাণ বাঙালী-ছাত্রদের চিত্তে emotion একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। এবং তাদের ধর্ম্মঘট হচ্ছে তারই একটা বাইরের নিদর্শন। ও ব্যাপারটা হচ্ছে চিত্তরঞ্জনের পদে তাদের প্রাণের আবেগ মাখা ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান। তাই আমি ভাবি যে হিন্দুর অন্তর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বড় বিশেষ হয় নি—ভোল ফিরিয়েছে মাত্র। সেকালে তারা মন্দিরে মন্দিরে কর্‌ত পাথর-গড়া প্রতিমাপূজো, একালে ইংরেজী শিখে তারা করছে পুলপিটে পুলপিটে রক্ত-

মাংসে-গড়া মানুষপূজো। এই তফাৎ। এবং এ তফাতে তফাৎ হচ্ছে এই যে, মানুষ প্রতিমা যখন গড়ে তখন সে তাকে নিজের মনের মধ্যেই থেকেই গড়ে, সুতরাং তার পূজোয় মানুষ আপনাকেই ফিরে পায়, কেননা নির্জ্জীব প্রতিমায় সে আপনার সত্বাকেই আরোপ করে। কিন্তু মানুষ যখন মানুষকে পূজো করে তখন সে আপনাকে হারায়, কেননা তখন পূজ্য মানুষের সত্ত্বা দিয়ে আপনার সত্বাকে ঢেকে ফেলে। কথাটা যে স্বদেশী-পেনাল কোডের ১২৪ক ধারায় আলবৎ পড়বে সে বিষয়ে আমার দিব্য জ্ঞান আছে, তবুও যে ভরসা করে' কথাটা বলে ফেল্‌লুম সেটা এই সাহসে যে, আমি হিন্দুও নই ও বর্ত্তমানে সশরীরে হিন্দুস্থানেও নেই।

মনে করবেন না যে আমার জানা নেই—না, তা জানি যে ইংরেজীতে Hero-worship বলে' একটা জিনিস আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, ঐ ইংরেজীতেই mass ও class বলেও দু'টি কথা আছে। মানুষ পূজো করে mass-এ আর Hero-worship করে' class-এ। কারণ ওর প্রথমটা করতে হয় চোখ বুঁজে আর শেষেরটি চোখ খুলে। গুজরাতের শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে mass-এর কাছে দেবতা হ'য়ে উঠেছেন তা ত চোখেই দেখছেন ও কানেই শুনছেন। কিন্তু তিনি যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছেও তাই হ'য়ে ওঠেন তবে গান্ধীজির পূজো চলতে পারে বটে কিন্তু দেশসেবায় মন অন্যমনস্ক

হবেই হবে কিছু। কেননা দেশ জিনিসটার অনেকখানিই Abstract, অন্তত একালে তাই হয়ে উঠেছে; সুতরাং তা বুঝতে হ'লে জ্ঞান জিনিষটা আহরণ দরকার, অপর পক্ষে মানুষ জিনিষটার অনেকখানিই concrete,—তা দেখতে হ'লে চোখ খুললেই যথেষ্ট। এবং আপনাদের হিন্দু জাতটা আজকাল মন বুদ্ধিতে এমনি আলসে হ'য়ে উঠেছে যে, তারা কি ভৌতিক লোকে কি আধ্যাত্মিক লোকে জ্ঞান-যোগকে দূরে রেখে ভক্তিযোগে কেল্লা ফতে করতে চায়। সুতরাং তাদের কাছে দেশের কথা ভাবার চাইতে একটি লোকের কথা শোনা যে আরামের তা বলাই বাহুল্য। এবং ঐ ব্যবস্থার পরিণাম ফল হচ্ছে দেশসম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞানতা ও ঐ মানুষসম্বন্ধে অতিরিক্ত সজ্ঞানতা। আর ওর ফল ধীরে ধীরে দেশবাসীর দেশের সেবক না বনে' ঐ মানুষের শিষ্য বনে' যাওয়া। ওর ফলে সহজেই দেশের কথা একটু নীচে পড়েই পড়ে।

কিন্তু ডেমোক্রাসির গোড়াকার Principle হচ্ছে mass কে class-এর দিকে ধরে' তোলার চেষ্টা করা, class-কে mass-এর দিকে টেনে নামাবার মতলব করা নয়। কেননা mass যত class-এর দিকে যাবে, ডেমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্টও তত সহজ ও সত্য হ'য়ে উঠবে আর class যত mass-এর দিকে ঝুঁকবে তত তাদের জন্য অটোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। আর অটোক্রাটিক গভর্ণমেণ্ট মানে যে ব্যুরোক্রাটিক

গভর্ণমেন্ট তা অভিধান খুঁজে না পেলেও অভিজ্ঞতা খুঁজে পাওয়া যায়ই। আর বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক বক্তাদের মুখে যে বক্তৃতা শুনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে, তাদের সংগ্রাম ঐ অটোক্রাটিক ও ব্যুরোক্রাটিক গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে। এই অটোক্রাসি বা ব্যুরোক্রাসির সঙ্গে সংগ্রাম একদিন ছুদিনের নয়, তা চিরকালের। কেননা সর্ব্বে সর্ব্বা হবার ইচ্ছার একটা বীজাণু প্রত্যেক মানুষের অন্তরের একপাশে চিরকাল বর্ত্তমান র'য়েছে।

মানুষ যেখানে প্রাণবান ও বুদ্ধিমান সেখানে সে প্রতি মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার পরের প্রতি মুহূর্ত্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সম্বন্ধে মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই জ্ঞান লাভ করেছে যে, যখন সেটা এক জনের উপর নির্ভর করে তখন সেটা একদিকে যেমন খুবই ভাল হতে পারে অন্যদিকে আবার তেমনি খুবই খারাপ হতেও আটক নেই। কিন্তু যখন সেটা দশজনের উপর নির্ভর করে তখন সেটা ভালর দিকে যত ভালই হোক্ না কেন, খারাপের দিকে খুব খারাপ একেবারে হতে পারে না। অটোক্রাসির মধ্যেই নিরোর আবির্ভাব সম্ভব, অটোক্রাসির মধ্যেই মাদাম পম্পাদোর মাদাম ড্যুবারির সম্মোহন মন্ত্রের সফলতার সম্ভাবনা। দেখে শুনে মানুষ বললে—কাজ নেই আমার চতুর্দ্দশ লুইয়ের দেওয়া সম্পদ গৌরব, ষোড়শ লুইয়ের দেওয়া-বেদনা ও অশ্রুর সম্ভাবনাকে

অসম্ভব করে' তুলতে হবে। দুঃখে কষ্টে ক্লান্ত মানুষ তখন বলেছিল—সুখে আমার কাজ নেই, স্বস্তিই আমার ভাল। উৎকৃষ্টের সম্ভাবনা অপকৃষ্টের সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে রাখে। দুঃখের কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে মানুষ বলে' ফেল্‌লে —উৎকৃষ্টের আশা একেবারে ছাড়তে হয় তাও স্বীকার কিন্তু অপকৃষ্টের অবিচার অজ্ঞানতা ও হৃদয়হীনতা আর চাই নে। সে দিন থেকে এ-যুগের ডেমোক্রাসির সূত্রপাত। আজ হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক বক্তাদের মুখে ঐ ডেমোক্রাসির সূত্র টীকা ও ভাষ্য শোনা যাচ্ছে।

ডেমোক্রাসির মতলব হচ্ছে এই যে, পাঁচজনে মিলে দেশ-শাসন করবে আর দশজনের মতামত নিয়ে। কেননা এটা সত্য বলে ধার্য্য হয়েছে যে, দেশের দশজন সমাজের মঙ্গল কিসে হবে তা বুঝতে না পারলেও অমঙ্গল কিসে হচ্ছে তা টের পায়। কারণ মানুষ মাত্রই নিজের ইষ্ট না বুঝলেও নিজের কষ্ট বোঝবার বেলায় দেরী করে না। কল্পনা থাকে দু'একজনের কিন্তু বাস্তবের জ্ঞান থাকে সবারই। ডেমোক্রাসির ব্যবস্থা হচ্ছে দু'এক জনের কল্পনাকে না-মঞ্জুর করে' সবার বাস্তব জ্ঞান দিয়ে কাজ চালান। কারণ এটা দেখা গেছে, দু'একজনের কল্পনা দেশকে যেমন আকাশেও উড়োতে পারে তেম্‌নি আবার পাতালেও ঠেলতে পারে।

সুতরাং এই ডেমোক্রাসির পরিপন্থী হচ্ছে কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রভাব—যদি সে প্রভাব class-কেও অন্ধ করে'

তোলে—অবশ্য mass চিরকালই অন্ধ এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবেই হেলে দোলে টলে ও গলে। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রভাবও কতকটা ঐরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান্ধীজির প্রভাব দেশের জনসাধারণকে ত একরকম অন্ধ করে' তুলেছেই, শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও অন্তত এক চোখ কানা করেছে। অবশ্য গান্ধীজির প্রভাবের যে, একটা সুফল না আছে তা নয়। ওর সুফল হচ্ছে এই যে, তা অন্ধ m iss-কে সচল করেছে—আর ওর কুফল হচ্ছে এই যে চোখওয়ালা class-কে অন্ধ করে' তুলেছে। ওই সুফলটা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক সুফল—সাময়িক ও বর্ত্তমানের, আর ওই কুফলটা হবে দেশবাসীর psychological কুফল—ভবিষ্যতে যেটা থেকে যাবে। গান্ধীজির মুখের কথা আজ সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। ওর কুফল বর্ত্তমানের গণ্ডগোলে ধরা না পড়লেও ভবিষ্যতের পটে আঁকা রয়েছে। গান্ধীজি খুবই বড় কর্ম্মী, তবে তিনি খুব বড় thinker নন; কিন্তু তাঁর প্রভাব আজ সবার চিন্তা-শক্তিকে আড়ষ্ট করে' দিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাও আজ গান্ধীজির মুখ থেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য হচ্ছে। ঐ অবস্থা ডেমোক্রাটিক স্বরাজ লাভের অবস্থা নয়। ও-অবস্থার logical conclusion হচ্ছে slave mentality কায়েম হওয়া।

আপনি বলতে পারেন যে, গান্ধীজি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

চিন্তাশক্তি আড়ষ্ট করে’দিয়েছেন তার প্রমাণ কি?—প্রমাণ আছে, দু’একটা দিচ্ছি।

গান্ধীজির মতলব হিন্দুস্থানের মাতৃভাষাগুলোকে অপ্রধান করে’ একমাত্র হিন্দুস্থানীকে সবার কণ্ঠে বসিয়ে দেওয়া—ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল-একতার খাতিরে। এতবড় একটা আত্মহত্যাকর ব্যাপারের প্রতিবাদ কিন্তু কোনখান থেকেই শোনা যাচ্ছে না। গান্ধীজির কণ্ঠস্বরের আভাসে সবার বিচার বিবেচনা সব কোথায় তলিয়ে গেছে। পলিটিক্স যে জাতীয় আত্মার মূল নয়, সেটা জাতীয় আত্মার ফুল এটা সবাই ভুলেছে। আর এই জাতীয় আত্মা গড়বার প্রধান ও শক্তিমান যন্ত্র ও মন্ত্র হচ্ছে সেই জাতির সাহিত্য—আর সাহিত্য জিনিসটা প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই গড়তে পারে। অথচ সেই মাতৃভাষার বিরুদ্ধেই অভিযোগ যে, তা জাতীয় একতার বিঘ্ন! জাতীয় আত্মা থাকবে না অথচ জাতীয় সত্বা থাকবে এ কেবল পলিটিশিয়ানদের মুখ দিয়েই বের হওয়া সম্ভব। পলিটিক্যাল মুক্তি মানে যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু তা হিন্দি ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙালী ও পেশোয়ারীকে এক করবার মতলবেই বোঝা যাচ্ছে। একাকার করে’ একতা লাভের ইচ্ছার জন্ম হচ্ছে পলিটিক্যাল অধীরতায়। প্রত্যেক মানুষটিকে খাটো করে’ সমাজকে দেবতা করে’ তোলার যে কি ফল তা হিন্দুসমাজই ঘোষণা করছে। জীবাত্মাকে বাদ দিয়ে পরমাত্মা লাভের চেষ্টা নিশ্চয়ই দর্শন শাস্ত্রের বাইরে। বঙ্গ বিহার

উৎকল মাদ্রাজ মারহাট্টা গুর্জ্জর পঞ্জাব রাজপুতনা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষটা মানচিত্রে দেখা গেলেও মনচিত্রে দেখা যায় না। চোখে-দেখা সোজা রাস্তাটাই যে সোজা নয় এ-জ্ঞান সবাই হারাত না—যদি না মহাত্মা গান্ধীজির মুখ দিয়ে হিন্দুস্থানীর গুণগান বেরুত। আসলে কিন্তু যা দরকার সেটা হচ্ছে হিন্দুস্থানের প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার পুষ্টি, তার সাহিত্যের সৃষ্টি; তবেই দেখা যাবে যে সমস্ত হিন্দুস্থানের মনের চেহারা বদ্‌লে গিয়েছে এবং প্রাণ ও আত্মা রস পেয়ে সঞ্জীবীত হয়েছে। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" এর হিন্দি ও হয় না হিন্দুস্থানীও হয় না। অথচ বাঙলা ঐ কথা বল্‌তে পেরেছে বলে বাঙালী ঐ কথা শুন্‌তে পেয়েছে বলে ভারতবর্ষ আজ যা তাই। নইলে কেবল আমদানী রপ্তানীর statistics ঘেঁটে যে স্বাদেশিকতা তা জাতিকে ধনী করতে পারে কিন্তু বড় করতে পারে না। দেশকে ধনী ত হতেই হবে কিন্তু তার চাইতে বড় কথা যে, দেশকে মানীও হতে হবে। ধনী-হওয়া বস্তু জগতের ব্যাপার কিন্তু মানী হওয়া মনোজগতের কথা। মাতৃ-ভাষার অঙ্গে আঘাত অর্থ মনেই আঘাত। মানুষের সভ্যতার ধর্ম্ম ও নিরিখ হচ্ছে ধন ও মন পাশাপাশি এগিয়ে চলা। মানুষের মাতৃভাষাকে আঘাত করা মানে soul force-কে আঘাত করা। কেননা মাতৃভাষার পিছনে রয়েছে—মানুষের শক্তিমান আত্মা।

আসলে হিন্দুস্থানের সমস্যা হচ্ছে অপূর্ব্ব, সে সমস্যার সমাধানও হতে হবে অপূর্ব্ব। আজকাল রাজনৈতিক বক্তাদের

মুখে হামেশা শোনা যাচ্ছে ভারতর্ষ এক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাই যদি হয় তবে পাঁচ সাত হাজার বছরেও ভারতবর্ষে এই একত্বটা দানা বেঁধে কঠিন হ'য়ে উঠল না কেন? আসলে সারা ভারতবর্ষ এক, কিন্তু এই একত্বটা সহজ নয়। সহজ যদি হত তবে পাঁচসাত হাজার বছরেও সেটা মিথ্যা হ'য়েই রইল কেন? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দুস্থানের দেশ প্রদেশগুলোকে জাতিগুলোকে (তাও সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ, হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত কোন দিনই নয়) এককরে', রাখতে পেরেছে তখনই যখন তার মাথায় ছিল একটা শক্তিশালী রাজসরকার। ঐ এক অশোক এক চন্দ্রগুপ্ত এক আকবর। আবার যখনই তাঁদের অভাব হয়েছে তখনই আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এ-খেলা অবশ্য দু' একবার হয় নি, বার বার হয়েছে। ওটা অবশ্য সারা হিন্দুস্থানের সহজ একত্বের প্রমাণ নয়।

কিন্তু হিন্দুস্থান সম্বন্ধে মজা ও মুস্কিলের কথা এই যে "সব জাতিগুলো এক" এ কথা সত্যি নয় বলেই যে উল্টোটাই সত্যি, তাও নয়। এটা একটা মস্ত বড় paradox সন্দেহ নেই—আপনাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত। এই paradox-সমস্যার সমাধান করবার জন্যে যুগে যুগে হিন্দুস্থানের বুকে নতুন নতুন ব্যথা বেজেছে, নব নব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে ফিরেছে। সারা হিন্দুস্থান এক এই হিসেবে যে, সারা হিন্দুস্থানের পিছনে রয়েছে আর্য্য ও অন্-আর্য্য সভ্যতার মিশ্রণের ধাক্কা, আবার সারা হিন্দুস্থানের জাতিগুলোর পার্থক্য এই কারণে যে, ঐ দু-রকম সভ্যতার মন্ত্র তন্ত্র

যন্ত্রগুলো এক এক জাতির হাতে পড়ে' এক এক আকার ধারণ করেছে। তাই বাঙালীর মুখের জায়গায় তামিলের বসেছে নাক, আবার তামিলের নাকের জায়গায় বাঙালীর বসেছে মুখ।* বাঙালী ও তামিলের মুখ ও নাকের এই পার্থক্য ঘোচান যায় কি না জানি নে, কিন্তু ঐ পার্থক্য ঘোচান মানে ও-দুই জাতির বাগেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় জখম্ করা। অবশ্য যৌগিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করে' সমাধি লাভ করলে মনের কি অবস্থা দাঁড়ায় তা আমি জানি নে; কিন্তু মানুষের সহজ জীবনে ইন্দ্রিয়ের হানিতে যে মনের ও হানি তা কানা ও কালাকে দেখলে শুন্‌লেই বোঝা যায়। এখন মন যদি আত্মার প্রকাশের যন্ত্র হয় তবে মনের হানিতে মনের দৌর্ব্বল্যে soul force-ও আপনাকে প্রকাশ করবার ও সার্থক করবার সুযোগ পাবে না। যে বাণী ধীরে ধীরে মানুষের আত্মাকে উদ্বোধিত করবে—যে বাণীর শক্তি স্পর্শ তিলে তিলে জাতীয় আত্মার শক্তিকে জাগরিত করে' তুল্‌বে পলিটিক্যাল বুদ্ধির ক্ষেত্রে সেই বাণীকেই লাষ্ট ক্লাশে ফেলে soul force এর ব্যাখ্যা চল্‌ছে অথচ দেশের কোথাথেকেও তার প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না।

তারপর ধরুন শিক্ষার কথা। নন্‌-কো-অপারেশন মুভ্‌মেণ্টের সুরু থেকে গান্ধীজি ও তাঁর লেফ্‌টেনাণ্টদের মুখ থেকে কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও অস্পষ্টভাবে এই রকমের কথা শোনা যাচ্ছে যে, ছেলেদের ইস্কুল-কলেজ ছাড়াটাই একটা বড় কথা—ইংরেজ-

* তামিল 'মুক্কু' মানে নাসিকা এবং "নাক্কু" মানে জিহ্বা।

রাজসরকারের স্থাপিত বিত্তাপীঠগুলো বয়কট করাই একটা মস্ত কাজ। ছেলেরা আর যদি কিছু না ও করে, খালি ঐ বিত্তালাভে আপনাদের বঞ্চিত করলেই স্বরাজ-লাভটা অনেক এগিয়ে যাবে। ও-কথার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এই যে, হিন্দুস্থানের স্বরাজ লাভে আর যে জিনিসেরই দরকার হোক্ না কেন, যে-বস্তুটি নিতান্ত অনাবশ্যক সেটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের জ্ঞানার্জ্জন। অবশ্য এর উত্তরে শোনা যাবে যে, ইংরেজ-রাজসরকারের ইস্কুল-কলেজ থেকে জ্ঞানার্জ্জন হয় কে বল্‌লে?—ওখানে আসলে যে বস্তু অর্জ্জিত হয় সে হচ্ছে slave mentality. না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে ইংরেজ-রাজসরকারের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর "গুণ লখইতে লেশ না পাওবি দোষ গণইতে নাহি শেষ" এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দুর mentality-টা একেবারে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর মত lordly ছিল; কিন্তু তবুও উল্টো প্রশ্ন ওঠে এই যে, যে শিক্ষা slave mentality গড়ে' তুলেছে সেই শিক্ষার অভাব হলেই কি সবাই স্বাধীন-চেতা হ'য়ে উঠবে? তাই যদি হয় তবে নিরীহ নির্দ্দোষ নিষ্পাপ দীনুদাসের বিশ্বই হোক্ বিদ্যালয়ই হোক বা—বিশ্ব বিদ্যালয়ই হোক্ এ সবের ত কোন বালাই নেই —বিদ্যালয়ে যাওয়া ত দূরের কথা, একটা সে চোখেও দেখে নি—সে কোন রকমের হরফ চেনে এ অপবাদও কেউ কোন-দিন দিতে পারবে না—গাঁয়ে দারোগো ঢুকলে তারই বুকের পাঁজরায় তার হৃদ্‌পিণ্ডটা সবার প্রথমে অস্বাভাবিক ভাবে আছাড়

খেয়ে পড়তে থাকে কেন? Negativism দিয়ে positive কিছু লাভ হয় কেবল এক বৈদান্তিক-বিদ্যালয়ে, পলিটিক্যাল-পাঠশালায় তার কোন সম্ভাবনা নেই। বৈদান্তিক মুক্তি আর পলিটিক্যাল মুক্তি যে এক কথা নয়, তাতো চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে বেদান্তের কোনও ধারও ধারল না যারা তারা আজ পলিটিক্যালহিসেবে মুক্ত—আবার যারা জন্ম জন্ম বেদান্তের ব্যাখ্যা করে' কাটাল তারা আজ পলিটিক্যাল মুক্তির জন্য হাঁকা হাঁকি সুরু করলে।

আসলে কিন্তু যে জিনিসটা সবার আগে সবার মাঝে সবার পিছনে দরকার সেটা হচ্ছে জাতির জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা জাগিয়ে রাখা জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা খুলে রাখা। Light, light more light. এ-যুগের এক বাঙালী হিন্দু-কবিও গান করেছেন—"আলো আমার আলো ওগো ভুবন-ভরা।" দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতারা যদি সমঝেই থাকেন যে, সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলো আলো খালি অল্প করেই বিতরণ করছে তবে প্রথমেই তাঁদের দরকার বিদ্যাপীঠকে নিজ হাতে গড়ে' তোলা যেখান থেকে জাতির অন্তরে বাহিরে আলোর অজস্র রেখা সম্পাত হবে। জাতির জ্ঞানের প্রদীপ অত্যুজ্জ্বল হয়ে না উঠলে স্বরাজ লাভও হবে না আর লাভ হলেও তা টিকবে না। সুতরাং নেতাদের পক্ষে ঐ দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে শুধু বক্তৃতা করে, বেড়ানো' খুব সহজ হ'তে পারে কিন্তু তাই বলেই যে তা শিব, তা অবশ্য নয়। এর চাইতেও

বড় মজার কথা আছে। Village organisation-এর কথা উঠেছে। Village organisation করবে কারা?—ছেলেরা, যারা সরকারী কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কলেজের ছেলেরা যারা পড়া ছেড়েছে, তারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই অন্তত পক্ষে চোদ্দটি বছর করে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্কুল-কলেজে কাটিয়েছে। এটা সত্য বলে' ধার্য্য হয়েছে যে, ওখানকার শিক্ষা কেবল slave-ই গড়ে তোলে। সুতরাং চোদ্দ বছরে ঐ ছেলেরা নিশ্চয়ই পাকা slave হ'য়ে উঠেছে। এই সব slave-দেরই পাঠান হবে village organisation করবার জন্যে! অথচ এতে দেশের শিক্ষিত কেউ-ই শঙ্কিত হ'য়ে উঠেন নি। একদিকের হিসেবে যারা কেবলই slave আর এক-দিকের হিসেবে তারা যে কি করে' স্বাধীনতার বাণী প্রচার করবে, মুক্তির স্পর্শ পল্লীতে পল্লীতে সংক্রামিত করে' দেবে তা বুঝবার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র এক পলিটিক্যাল বুদ্ধির। Slave-দের সংস্পর্শে এসে তাদের আত্মার স্পর্শে পল্লীতে পল্লীতে সব village Hampden-এর জন্ম হবে এমন অদ্ভুত কথা অবশ্য soul-force-এর উপাসকদের বিশ্বাস করা চলে না। তবুও যে এই ব্যবস্থাই হচ্ছে তার কারণ বোধ হয় শিক্ষিতেরা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের slave গড়া কথাটা বিশ্বাস করেন না, নয় soul force-কে তাঁরা অত উঁচুতে স্থান দেন না, হয় ত তাঁদের বিশ্বাস যে soul force-এর চাইতেও বড় force হচ্ছে মুখের কথা। কথার সঙ্গে কাজের যে এমন

নন্‌-কো-অপারেশন চলছে সে কেবল Non-co-operation-এর দৌলতে। অথচ কোনখান থেকে এর তেমন সমালোচনা চলছে না। বলুন ত এতে democratic স্বরাজ এগুচ্ছে, না পেছুচ্ছে? এখন মনে পড়ছে এক Non-co-operator ছোকরার কথা। সে বলছে, "মহাত্মা গান্ধী যখন বলেছেন ন' মাসে স্বরাজ লাভ হবে তখন তা নিশ্চয়ই হবে, তবে আমাদের independence লাভ করতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে।" মনে করবেন না ছোকরাটি ঐ কথাটা বলে-ছিল কৌতুক করে,—মোটেই না। কেননা সে ছোকরাটির আর যে দোষই থাক না কেন, এ অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না যে, wit বা humour বলে' পদার্থ তার দেহে বা মনে কোথাও আছে। বিশেষত গান্ধীজির কথা নিয়ে satire করা তার কাছে একটা অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত অসম্ভব ব্যাপার, কেননা গান্ধীজি তার কাছে একজন অবতার-বিশেষ।

তবে অবশ্য নিরাশার কিছুই নেই। কেননা জেগেছে যে জাত, প্রাণবন্ত হয়েছে যে জাত, তার সাম্‌নে কোন বাধাই বাধা নয়—কোন ভুলই ভুল নয়। আমরা সূক্ষ্ম-জগতের জীব যারা তাদের কাছে ভুল ভুল বলে' এমনিই ধরা পড়ে—কিন্তু স্থূলজগতের যারা তাদের ভুলকে ভুল বলে' জান্‌তে হয় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এক Non-co-operator কলেজের ছেলে উত্তর বাঙলার গাঁয়ে মাসখানেক

ঘুরে শহরে ফিরেছে—এইবার তার চোখ ফুটেছে। তার চোখ ফুটেছে এই যে, দেশের mass-কে জাগাতে হলে খালি দু' দশজন ঘুরে বেড়িয়ে বক্তৃতা দিলে চল্‌বে না—চাই এমন কতগুলো লোক, যারা পল্লী-জীবনকে বরণ করে' সারা জীবন ঐ পল্লীতে থাকবে পল্লীর সুখে দুঃখে আপনাদের জীবন মেশাবে। সে আজ পল্লীবাসীদের বিরাট অজ্ঞতার সন্ধান পেয়েছে—যে অজ্ঞতার পাহাড় বক্তৃতায় টলবেও না গল্‌বেও না। চাই অনেক লোকের জীবনব্যাপী সাধনা। চাই শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষার বিস্তার। পল্লীকে সামনা সামনি দেখে আজ সে বুঝেছে যে, সেখানে romance-এর স্থান নেই—আছে কেবল কঠিন উৎকট Reality. কথায় কথায় সে বলছিল কোন গ্রামে একটা ইস্কুলের কথা। ইস্কুলটি বেশ চলছিল—ছাত্রও জুটেছিল মন্দ নয়। কিন্তু ইস্কুলটি Non-co-operation-এর ধাকায় ভেঙে গেল। ছেলেটি ওর উপরে অবশ্য কোন মন্তব্য করলে না। কন্ঠ আমার কানে যেন এসে বাজল—a suspicion of regret.

আজ এইখানেই ইতি করি। মাঝে মাঝে আমাকে আপনার খবর দেবেন। জানেন ত আপনার খবর পেলে আমি কত খুশী হই। তবে আসি এখন। সালাম। ইতি—

আপনার দোস্ত

আবুল ফজল

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

চিনু—

বার বার তুমি আমাকে আঘাত করতে পেরেছ বলেই যে আমি তোমাকে বড় বলে' মান্‌ব তা নয়। গত পাচ ছ বছরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আওতায় কোন কোন ইংরেজ আমলাও আমাদের আঘাত করেছে কিন্তু তাই বলেই এ-কথা মান্‌ব না যে ইংরেজ জাতি আমাদের চাইতে বড়। অবশ্য তুমি এ-কথার উত্তরে প্রশ্ন করবে যে তবে কি ব্রিটিশ নেশন আমাদের চাইতে ছোট। যে-নেশনের দু' চার লাখ লোক আমাদের তেত্রিশ কোটী নর নারীকে হাতের মুঠোর মধ্যে দেড় শ' দু' শ' বছর রাখতে পেরেছে তারা যে আমাদের চাইতে ছোট এ-কথা মনে করতে হ'লে যে-রকম আধ্যাত্মিক সাল্‌সা উদরস্থ করা দরকার সে-রকম আধ্যাত্মিক সাল্‌সাকে আমি চিরকাল এড়িয়ে এসেছি। যে আধ্যাত্মিক সাল্‌সা মানুষের কর্ম্ম করবার রোখ বাড়ায় না কেবল কল্পনা করবার ঝোঁক বাড়ায় তেমন আধ্যাত্মিক সালসার প্রতি আমার কোনদিন অনুরাগ ছিলও না আর কোনদিন যে সে-অনুরাগ হবার সম্ভাবনা আছে তা-ও নয়। আত্ম-প্রতারণার আরাম পেতে হ'লে যতখানি অন্ধ সাজা দরকার ততখানি অন্ধ আমি কোন দিনই সাজ্‌তে পারি নি। জীবনের বিচিত্র প্রকাশে যা সার্থক হ'য়ে ওঠে না তার প্রতি আমার প্রাণের টান

কোনদিনই নেই। আমার বিশ্বাস জীবন আছে প্রকাশের জন্য নির্ব্বাণের জন্য নয়। জীবনের এই ধর্ম্মই আমার কাছে সবার চাইতে বড় আধ্যাত্মিকতা। এ-থেকেই বুঝতে পার যে যে-ইংরেজের কর্ম্ম ও চিন্তা সারা জগতে ছড়িয়ে গিয়েছে, যাদের জীবনের প্রকাশ অনিবার্য্য হ'য়ে চারিদিকে ফুটে উঠেছে সে-ইংরেজ আমাদের চাইতে ছোট এ-কথা মনে করবার মতো মনের ভঙ্গী আমার নয়।

তবে আমার শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে ইংরেজ জাত আমাদের চাইতে বড় কিন্তু সেটা তারা ঐ আঘাত করতে পারে বলে' একেবারেই নয়। বরং আমাদের মতো দুর্ব্বলকে তারা যে পরিমাণে অঘাত করেছে ও করবে ঠিক সেই পরিমাণেই তারা ছোট হয়েছে ও হবে। এ-কথাটাকে শুধু দুর্ব্বলের সান্ত্বনা বলে' ধরে' নিও না। ওর পিছনে এমনি একটা অনিবার্য্য সত্য আছে যার হিসেব দু' এক দিনে খুব বড় না হ'তে পারে কিন্তু দু'দশ বছরে বিশ ত্রিশ বছরে তা চোখে পড়বেই।

এ-কথাটা সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য যে তুমি ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে আমাকে আঘাত করেছ কি না তা আমি জানিনে সুতরাং সে-অভিযোগও আমি তোমার বিরুদ্ধে আনতে পারিনে কিন্তু আঘাত যে একটার পর একটা করে' আমি পেয়েছি তাও ঠিক। তুমি ইচ্ছে' করে যে সে-সব আঘাত করনি তাতে যে তার বেদনা কিছু কম তীব্র ও কম নিষ্ঠুর হয়েছে তা নয়। এত কথা যে তোমায় আমি আজ বলছি তার কারণ আজ আমার

কোন দুঃখ নেই ক্ষোভ নেই—বরং ও ব্যাপারে লাভের দিকটাই আজ আমার চোখে পড়ছে। যে-দুঃখের বোঝা পাহাড় হয়ে বুকে নেমেছিল যে-বেদনা অশ্রু-সাগর হ'য়ে দু'চক্ষু অন্ধ করে' তুলেছিল তাও ত গেল। কিন্তু তা রেখে গেল এমন একটা মঙ্গল যা হাজার হাসি গানের ভিতর দিয়ে লব্ধ হ'তে সহস্র যুগেও পারত না। তাই আজ ভাবি যে আঘাত না পেলে—দুখের আঘাত না পেলে—মানুষ মানুষ হয় না। দুঃখই মানুষকে আত্মস্থ হ'তে শেখায়—নিজের অন্তরের দিকে ফেরায়। তোমার দেওয়া আঘাতের পর আঘাতে আমাকে সেই দিকেই ফিরিয়েছে। এত বড় একটা মঙ্গল তুমি আমাকে দান করেছ। তাই আজ আমি তোমাকে আমার আন্তরিক নমস্কার জানাচ্ছি।

আজ আমার মনে পড়ছে সে-দিনের কথা যে দিন তুমি নৌসেরাতে আমাদের মাঝে গিয়ে পড়লে। আমরা তিনজন হাবিলদার লেফ্‌টেনাণ্ট রায়ের সঙ্গে messing করবার অনুমতি পেয়েছিলুম। লেফ্‌টেনাণ্ট রায়ের সঙ্গে আমাদের তিন হাবিল-দারেরই কলেজ-অবস্থা থেকে পরিচয়—আমার সঙ্গে তার একটু বেশী ও বিশেষ বন্ধুত্বই ছিল। আমরা একটা ছোট্ট বাড়ী পেয়ে-ছিলুম, সেই বাড়ীতে আমরা চারজনে থাক্‌তুম। তুমি সেইখানে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে না হলেও—যুদ্ধক্ষেত্রের নেপথ্যে ত বটে, অসংখ্য গোলাগুলির মাঝে অবিরাম বারুদের গন্ধের মাঝে, সকাল সন্ধ্যে কুচ-কাওয়াজের মাঝে, মানুষকে হত্যা করবার জন্যে তৈরী-হবার সাধনার মাঝে গিয়ে উদয় হয়েছিলে একেবারে

ভগবানের সহজ কৃপাশীর্ব্বাদের মতো। আমার কি মনে হয়েছিল জান? মনে হয়েছিল যেন দুরন্ত মরুভূমির লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী শুষ্কবক্ষ বালুকণার হৃদয় বিদীর্ণ করে' হঠাৎ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আকাশে উঠে আপনার নিবিড় সুশীতল ছায়ার মায়া-অঞ্চল দিয়ে যেন চারিদিকে ঘিরে দিলে। সহস্র সহস্র লোক এখানে মরবার জন্মে মারবার জন্মে প্রস্তুত হচ্ছে। কি শৌর্য্য, কি বীর্য্য, কি গৌরব! কিন্তু ওর যেন কিছুই সহজ নয় স্বতঃ নয়। সবার চোখেই যেন কি একটা সঙ্কোচের রেখা অস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে আছে। বাইরের শত ঝন্‌ঝনা শত মূর্চ্ছনা কিছুতেই সেটাকে মুছে ফেল্‌তে পারেনি। সেই সহস্র সহস্র শক্তিমান শোণিতাকাঙ্ক্ষীর মাঝে তোমার উদয় যেন একটা দুর্নিবার সহজত্ব নিয়ে—একটা দুর্ব্বার কৃপাপরশ নিয়ে—মূর্ত্তিমান শুভ্রতা ও শুচিতা নিয়ে। যেন লক্ষ লোকের কোষের তরবারী ও কাঁধের বন্দুকের লজ্জা আর সেদিন আত্মগোপন করে থাকৃতে পারল না। যেন উত্তোলিত রুদ্র খড়্গের কোপের সাম্‌নে বিস্তৃত হল ক্ষুদ্র শিশুর ফুলের মতো কচি অকল্যান-জ্ঞানহীন হাত দুখানি। উত্তোলিত খড়্গ নাম্‌ল বটে কিন্তু সে হিংসায় নয় রোষে নয়—লজ্জায় ও অশ্রুধারায়।

আমি স্বেচ্ছায় যখন সৈনিক হয়েছি তখন যুদ্ধ ব্যাপারটার প্রতি যে আমার আন্তরিক অনুরাগ একটুকুও নেই এ-কথা সত্য করে' বলা চলে না—এবং ঐ কারণেই মানুষ হত্যার প্রতি যে আমার ভীষণ বিরাগ আছে তা বলেও শপথ করা চলে

না। কিন্তু সেদিন নৌসেরাতে তোমার আবির্ভাবে যে-সব ভাব আমার মনে প্রাণে উদয় হয়েছিল সে-সবও যে একেবারে মিথ্যারই কুহক এ-কথাও ত মান্‌তে পারলুম না। আজকাল পৃথিবীতে জাতি-মণ্ডলীর যে-অবস্থা তাতে সমাজের জন্য অস্ত্র-ধারণ যত প্রয়োজনীয়ই হোক্ না কেন, মানুষের সবার চাইতে বড় আনন্দলাভ ত অসুরত্বের ভিতর দিয়ে নয়। এই যে জগতব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বুভুক্ষিত নরনারী—যাদের ধন আছে জন আছে সম্পদ আছে বিভব আছে তবুও যারা বুভুক্ষিত—তাদের এ-ক্ষুধা মিট্‌বে কি কেবল হত্যায় ও হরণে? নৌসেরাতে সেদিন তোমার আবির্ভাবে দুটী ছবি আমার চোখে পাশাপাশি ফুটে উঠ্‌ল—একটা রুদ্রের তাণ্ডব নর্ত্তনের মতো, যেন আপনার অশান্তিতে আপনি পীড়িত—আর একটা শান্ত সমাহিত আত্মবান সৌন্দর্য্যের মহিমা—যা নিজের মধ্যেই নিজেকে সার্থক করে' তুল্‌ছে। আমার সৈনিক-জীবনকেও ঐ শেষের ছবিটীই আকর্ষণ কর্‌লে। এতকাল আমি রুদ্রের ভ্রূকুটীর সামনেও শির উন্নত করেই চলেছিলুম কিন্তু ঐখানে আমি অন্তর নত না করে' পারলুম না। এ নত-হওয়া ত আমাকে অপমান দিয়ে আবৃত কর্‌ল না—আমাকে মণ্ডিত কর্‌ল আনন্দের মহিমা দিয়ে।

তাই সেদিন আমি অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা বারুদের গন্ধ ইত্যাদির মাঝে থেকেও এমন একটা জগতের সন্ধান পেলুম ও সত্তা অনুভব কর্‌লুম যে-সত্তা রুদ্রের সত্তার চাইতে কত বড় ও কত

বেশী সত্যময় সৌন্দর্য্যময় ও আনন্দময়। আমার মনে হ'চ্ছ সারা বিশ্ব যদি ঐ জগতে উঠে যায় ঐ সত্বায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায় তবে সেটা বিশ্বমানবের যে কি মহান্ লাভ সেটা অঙ্ক কসে' দেখান যায় না। তবে সেটা কোনদিনও ঘটবে কি না তা কেবল এক সেই পরম লীলাময়ই জানেন।

তুমি বাঙালীর মেয়ে, নারী-সংস্পর্শ-শূন্য পুরুষের জীবন-যাপন ইংরেজিতে যাকে বলে Bachelor's life—তা দেখ্‌বার সুযোগ তোমার কোনদিন হয় নি। কেননা ঐ Bachelor বলে' জিনিসটী বাঙালীর সমাজে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কারণ ওখানে সবাইকে বিয়ে করতেই হবে—এবং সবাই বিয়ে করেও থাকেন তা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের সামর্থ্য থাক্ আর নাই থাক্। কিন্তু ঐ যে আমরা তিনটী হাবিলদার তোমার স্বামীর সঙ্গে নৌসেরাতে এক বাড়ীতে থাকতুম সেখানে আমরা যেভাবে দিন কাটাতুম সেটা ছিল এই রকম একটা ব্যাপার যে-ব্যাপারটা ডন্‌-কুইকসোটের সঙ্গে পিক্‌উইকের এবং ঐ দুয়ের সঙ্গে Three musketeers এর Heroকে মেশালে যা দাঁড়ায় তাই। চার মাসের ছুটিতে আমরা ছিলুম military decipline এর বাইরে—আর তখন আমাদের ছিল "ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর" "রাত্র কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাত্তি"—অবস্থা। খাওয়া ঘুমোনো ব্যাপারগুলো হ'য়ে উঠেছিল এম্‌নি বেহিসেবী যে তাকে devil's delirium ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বঙ্কিম

শান্তির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে হরে মুরারে"—আমাদেরও তখন ছিল ঐ কথা "এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?" কিন্তু তার পিছনে ছিল না ঐ "হরে মুরারে।" জীবনের রাশ এমন করে' নিশ্চিন্ত হয়ে অনিশ্চিতের মাঝে ছেড়েদেবার সুযোগ ও প্রবৃত্তি আর কারো কোথাও হয়েছে কি না জানিনে যেমন হয়েছিল আমাদের এবং আমরা সে-সুযোগের একটুও অসম্মান করিনি। এই রকম যখন আমরা চারজন আমাদের জীবনকে উধাও করে' ছেড়ে দিয়ে বসে' ছিলুম তখন তুমি আমাদের সেই অশান্ত উদ্দাম লীলার মাঝে উদিত হ'লে একেবারে মূর্ত্তিমতী শান্তির মতো।

তোমার আবির্ভাবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলুম যে আমাদের ভিতরে এবং বাইরে কেমন একটা সহজ সংযম ও শিষ্ট শৃঙ্খলা জেগে উঠল—যে-সংযম যে শৃঙ্খলার জন্যে আমাদের কারো কোন কষ্টও করতে হয় নি কৃচ্ছ্রতাও করতে হয় নি। সেটা এমনি স্বতঃ হ'য়ে দেখা দিল যে মনে হ'ল আমাদের আগের জীবন ইতিহাসকে ছাড়িয়ে একেবারে প্রত্নতত্ত্বের অধিকারভুক্ত হ'য়ে পড়েছে।

তাই আমার মনে হয় যে পুরুষ হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরে এনার্কিষ্ট—এনার্কিজম্ তার গিঁঠে গিঁঠে স্নায়ুতে স্নায়ুতে উদ্দাম চাঞ্চল্য নিয়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে—আর নারী হচ্ছে তার প্রতিবেধক। পুরুষ যেন বর্ত্তমানকে ভোগ করতে চায় তার সর্ব্বস্ব দিয়ে কিন্তু নারীকে যেন ব'য়ে চলতে হচ্ছে অতীতের

সমস্যা ও ভবিষ্যতের মীমাংসাকে। পুরুষের জীবনের যা-কিছু স্থায়ী তা সে লাভ করেছে নারীর সংস্পর্শ ও সংসর্গ গুণে। সন্ন্যাসীর অভাব নেই কিন্তু সন্ন্যাসিনী বিরল।

নারীর সংস্পর্শে যেমন পুরুষের মন শিষ্ট ও সভ্য হ'য়ে ওঠে নারীর সংসর্গে পুরুষের কর্ম্মও তেম্‌নি প্রয়োজনের হ'য়ে ওঠে। মানুষের সভ্যতার ঐ দুটোদিক—একদিকে সংযম আর একদিকে প্রয়োজন। ঐ দুটোই পুরুষ পেয়েছে নারীর কাছ থেকে নারীরই প্রয়োজনে। বিশ্বমানবের সভ্যতায় প্রত্যক্ষভাবে নারীর হাত তেমন না দেখা গেলেও পরোক্ষ যে প্রভাব সেখানে তার আছে তা নিতান্ত অপ্রত্যক্ষ নয়। আসলে একটু তালিয়ে দেখলে দেখা যায় মানুষের সমাজের আসল গ্রন্থিই হচ্ছে নারী। নারীকেই ধরে' নারীকেই কেন্দ্র করে' সমাজ আকার নিয়েছে। নারী না থাক্‌লে পুরুষের জীবনের ভঙ্গিমা যে কি রকম হত সেটা একটা মস্ত interesting গবেষণা। পুরুষ হচ্ছে যেন centrifugal force আর নারী, centripetal; ঐ centripetal forceএর গুণেই সমাজ দানাবেঁধে উঠেছে ও মানুষের সভ্যতা নিরাকার থেকে যায় নি।

সে যা হোক্ তুমি নৌসেরায় ত এলে—এসে সবার প্রথমে এই জিনিষটা আবিষ্কার কর্‌লে যে সেখানে তোমার সময় কাটাবার উপাদান ও উপকরণের নিতান্ত অভাব। দেশে নিশ্চয়ই তোমার সময় কাটত কতকটা ঘর কন্নার ব্যাপার নিয়ে আর কতকটা সঙ্গিনীদের সঙ্গে গান গল্প হাসি তামসা করে' কিন্তু

নৌসেরাতে অবশ্য গিয়ে দেখলে সে-সব করণ উপকরণ অধিকরণ সেখানে কিছুই নেই। এক ছিল বই পড়া ; কিন্তু সেই God forsaken নৌসেরাতে বই পাওয়াই এক বিষম ব্যাপার আর বই পেলেও একটা মানুষ আর কিছু রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা বই নিয়ে থাক্‌তে পারে না। আর এক ছিল আমাদের সঙ্গে গাল গল্প করা কিন্তু আমাদের মেয়ে পুরুষের মনের মধ্যে এমনি একটা gulf জেগে উটেছে যে সে gulf এর ওপরে সাঁকো না বেঁধে আর গাল গল্প চলেই না—বলা বাহুল্য সে অবস্থায় সেটা তেমন জমাট বাঁধে না। বিশেষতঃ আমাদের মেয়েদের মানস জগৎ এখনও এম্‌নি সীমাঘেরা আছে যে আধঘণ্টা কথা কইলে সে মনের সব কথা বলা হ'য়ে যায় আর নতুন কিছু বলবার থাকে না।

তোমার তিনমাসের প্রবাসে একটা বাঙ্গালী কিশোরী তরুণীর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুবিধা হ'ল। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজের যে অবস্থা ও যে ব্যবস্থা তাতে করে' এ সুযোগ কারোই ঘটে ওঠে না। আমরা দেখতে পারি একমাত্র আমাদের নিকটতম আত্মীয়াদের। বলা-বাহুল্য সে আত্মীয়াদের আমরা দেখি কেবল চোখ দিয়ে মন দিয়ে নয়। আর কিশোরী তরুণীকে দেখবার সুযোগ ঘটে বিবাহিতের, কেবলমাত্র তার স্ত্রীকে। সেও শুধু শয্যাপ্রান্তে ও নিদ্রালস নয়নে, অবগুণ্ঠিতা ও সঙ্কুচিতা। আমাদের মেয়েদের জীবনের যে সময়টাতে সবার চাইতে আলো বাতাস বেশী দরকার ঠিক সেই সময় থেকেই তা থেকে

তারা বঞ্চিত হ'তে থাকে। প্রচুর আলো বাতাসের রসদ পায় না বলে' তাদের জীবনের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হয় একটা মহা কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে, তাদের সবারই হয় stunted growth. এই জন্যে তারা সমাজে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও করতে পারে না বা প্রাণ শক্তিও চারিয়ে দিতে পারে না। আমাদের মেয়েরা আমাদের পুরুষদের মনকে রঙিন্ করে' তুলতে পারে না কেবল তাদের দেহের ধর্ম্মকে সঙীন করে' তোলে। আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমাদের মেয়েরা তাদের প্রাণ-ধর্ম্মকে সজীব করে তুলতে পারছে না।

ঐ-প্রাণ না হলে কিন্তু চলে না কেননা আমরা সবাই আছি প্রাণী-জগতে। আমাদের বাঁচবার পক্ষে বাড়বার পক্ষে প্রাণ অপরিহার্য্য। তুমি হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠে বলে' ফেলতে' পার—মানুষের প্রাণটা হচ্ছে ছোট জিনিস নীচের স্তরের তার আসল জিনিষ হচ্ছে আত্মা। আত্মা আসল ত বটেই কিন্তু মনে রেখো প্রাণ জিনিসটাও নকল নয়। ঐ প্রাণ বাদ দিলে যে আত্মা প্রেতাত্মাতে দাঁড়ায় সেটা দেখতে হ'লে হেলিগোল্যাণ্ডে যেতে হয় না। পলিটিক্যাল অবস্থার দরুণ আমাদের পুরুষদের প্রাণের ছুটবার পথ নেই আর সামাজিক ব্যবস্থার খাতিরে আমাদের মেয়েদের ও-বস্তুর ফুটবার উপায় নেই। তার উপর আছে আবার আধ্যাত্মিক সালসা। আর ও সালসার এমনি গুণ যে ওর কয়েক ফোঁটা পেটে পড়তেই আমরা দর্শনেন্দ্রিয় হারিয়ে দার্শনিক সাজি ও আত্মাকে হারিয়ে আধ্যাত্মিক বনি।

আমাদের মেয়েরা যে কুড়িতে বুড়ি বনে' যায় আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের প্রাণের ধর্ম্মের উপরে সমাজবুড়োর ও আচার-বুড়ীর মস্ত চোখ-রাঙানীটা! জীবনে সংযমের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এটা কেউ-ই অস্বীকার করবে না। কিন্তু জীবন যেখানে আছে সেই খানেই সংযমের সার্থকতা যেখানে কেবল মৃত্যু সেখানে ও-বস্তুর কোন অর্থই নেই। যা হোক্ যে সমাজে মায়ের জাত কুড়িতে বুড়ি হয় সে সমাজের ছেলেদের আয়ু যে ত্রিশ চল্লিশের মাঝামাঝি এটা নিতান্ত অন্যায় নয়।

কিন্তু সেদিন নৌসেরাতে আমরা একটি বাঙ্গালী মেয়ের ভিতরে কি রকম প্রাণ শক্তি থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে তার পরিচয় পেলুম। আমি তোমাকে তোমার বিয়ের পর দু'একবার দেখেছি কিন্তু সে বাঙালী পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে। কিন্তু সেই নৌসেরাতে যেখানে কোন সমাজই নেই আমাদের কারো তর্জ্জনীর শাসন নেই, কারো চোখের ভ্রূকুটী নেই সেখানে তোমার যে-মূর্ত্তি আমি দেখেছিলুম তোমার মধ্যে সে-মূর্ত্তির সম্ভাবনাকেও যে কল্পনা করতে পারি নি। দেখেছিলুম প্রাণের একটা অতি সহজ অতি স্বতঃ গতিভঙ্গিমা লীলাতরঙ্গ যা চারিদিকে আলোক আর সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আপন মনেই ছুটে চলেছিল। যেন স্রোতস্বিনী যা পাহাড়ের পাষাণ কারার মধ্যে কত যুগ গুম্‌রে গুম্‌রে মরছিল তা হঠাৎ ছাড়া পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। যেন কত যুগের বদ্ধ বায়ুতে

রুদ্ধ প্রাণ ছাড়া পেয়ে সুদ সুদ্দ আপনার প্রাপ্য আদায় করে' নিচ্ছে। যেন হাজার বছর ধরে' যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে তার সমস্তটা একটা ক্ষুদ্র দিনে ক্ষুদ্র হাতে সে আপনার করে নিতে চায়। আমি সেদিন তোমার মধ্যে যেন বাঙ্গালী জাতির সমস্ত তরুণী-সমাজের হাজার বর্ষ-ব্যাপী ব্যর্থ-হয়ে-থাকা ধর্ম্মের ও মর্ম্মের চেহারা দেখলুম। আমার মনে হ'ল আমরা ত আমাদের নারী-সমাজকে হত্যা করে করেই চলেছিলুম। এ-হত্যায় রক্তপাতের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না বলে' যে তা কম পাপের তা নয়। এ-পাপের বিচার সমাজের বিচারালয়ে হয় না বটে কিন্তু জীবন-দেবতার মন্দিরে যে এ-বিচার অবিরাম চল্‌ছে। সেদিন আমার চোখের সাম্‌নে একটা revelation হ'য়ে গেল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম—কিন্তু সে তোমার দৈহিক সৌন্দর্য্যে নয়, তোমার ঠোঁটের হাসিতে নয়, তোমার চোখের কটাক্ষে নয়—সে তোমার ঐ প্রাণের লীলার সঙ্গীতে। সেদিন যেন একটা জীবন্ত প্রাণ সাবয়ব হ'য়ে আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হ'ল এমন কোন কল্যাণ থাক্‌তেই পারে না যা এই প্রাণকে নষ্ট করবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাঁড়াতে পারে।

সেদিন আমি স্পষ্ট দেখলুম, এই যে নারী-সমাজের চারিদিকে একটা কঠিন দেয়াল খাড়া করে' তোলা হয়েছে তার পিছনে আছে আমাদের পুরুষ-সমাজের একটা বিরাট কাপুরুষ-তা। এ কাপুরুষতা উদ্ভূত হয়েছে সামর্থ্যহীন অহঙ্কার থেকে। সামর্থ্যহীন অহঙ্কারের ধর্ম্মই হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা

negativism দিয়ে। জীবনসংগ্রামে তার লাফিয়ে পড়বার সাহস নেই জীবন-সংগ্রামকে তাই সে বাইরেই রেখে দেয়। জাত বাঁচাতে হ'লে সে আর সবাইকে অস্পৃশ্য করে তোলে। এর ভিতরের কথাটাই হচ্ছে এই যে সামর্থ্যহীন অহঙ্কারের আপন আপন ধর্ম্মের উপরে তেমন বিশ্বাস নেই তেমন আস্থা নেই। ধর্ম্ম কথাটা এখানে আমি সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করছি। যেখানে আত্ম-বিশ্বাস রয়েছে যেখানে আত্ম-প্রত্যয় এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নি সেখানে "শিক্ষার মিলনে" ভয় থাকে না বরং মনে হয় শিক্ষার মিলন আত্মাকেই আরো পুষ্ট করবে সম্পদশালী করে তুল্‌বে। কিন্তু "শিক্ষার বিরোধ" আমরা সেইখানেই গড়ে তুলি যেখানে মনে করি পরের চিন্তার ধাক্কায় কর্ম্মের ধাক্কায় আমরা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারব না আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। জার্ম্মাণীতে সংস্কৃতের চর্চ্চা হয় এবং বেদ বেদান্তের আলোচনা হ'য়ে থাকে কিন্তু সেখানে এ-প্রশ্ন কোন-দিন ওঠে না যে ও-শিক্ষা তাদের শিক্ষার বিরোধী কি না। ও-প্রশ্ন ওঠে নি কেননা ও-রকম কোন প্রশ্নই নেই। আসলে শিক্ষার বিরোধ বলে' কোন বিরোধ নেই যে-বিরোধটা আছে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ন্যাশানালিজ্‌ম্‌এর। শিক্ষার বিরোধকে মেনে নেওয়ার অর্থ আত্মাকে ছোট করে' দেখা, আত্মার সামর্থ্য-হীনতা ও পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া।

মুসলমানী যুগের non-touchism আমাদের আত্মার দৈন্যই ঘোষণা করেছে'। আত্মার দৈন্য যখন ছিলই তখন non-

touchism হয়ত আমাদের উপকারেই লেগেছে। কিন্তু আজ এই ইয়োরোপীয় যুগে ঐ non-touchismকেই যে আমরা জীবন-বেদের ভিত্তি বলে' মানছি নে সেটা এরি চিহ্ন যে আমরা আমাদের আত্মার দৈন্যাবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌ছি। নিজের মধ্যে যখন জোর পাই তখনই পরের সঙ্গে কোলাকুলি করতে ভয় পাইনে।

এই যে non-touchism এ কিসের নামে? ধর্ম্মের নামে। ডাক্তারদের কাছে যেমন কুইনাইন আমাদের কাছে তেম্‌নি ধর্ম্ম। ও Politics বল Cow conference বল, ও Afgan invasion বল বা Everest Expedition বল সব সম্বন্ধেই আমরা মুখ খুলি ধর্ম্মের নামে। এ ধর্ম্ম কিন্তু সংস্কৃত অর্থে নয় ইংরাজি অর্থে। তার কারণ সংস্কৃত আমরা জানিনে সুতরাং ওর সংস্কৃত অর্থও আমরা জানিনে কিন্তু ইংরাজি জানি সুতরাং ওর ইংরেজি অর্থও জানি। ওর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে আমাদের সকল কাজে আত্মার পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি যতটা লোভ জাগে দেহের পুষ্টি সাধনের দিকে ততটা দৃষ্টি পড়ে না। ওর ফলে স্বর্গরাজ্যের প্রতি আমাদের যতটা দৃষ্টি পড়ে মর্ত্ত্যলোকের প্রতি ততটা মন পড়ে না। কিন্তু মর্ত্ত্যশক্তি আয়ত্ত না করেও মানুষের অমৃতত্ব লাভ হয় কিনা জানিনে কিন্তু মৃত্যু যে লাভ হয় তার প্রমাণ ভারতবাসীর ঘরে বাইরে পড়ে আছে।

মুসলমানী যুগে মুসলমানকে অস্পৃশ্য করে' তুলেছিলুম আমরা

ধর্ম্মের নামে আজ আবার দেখছি তাকে স্পৃশ্য না করে' ভুল্‌লে চলে না কেননা নইলে আমাদের পলিটিক্স অচল হ'য়ে পড়ে। এই অস্পৃশ্যতার ফলে কত শতাব্দী ধরে' হিন্দু মুসলমানের অন্তরে যে বদ্ধমূল ভেদবুদ্ধি শিকড় গেড়েছে এমন কোন্ পলিটিসিয়ান আছেন যাঁর আজ লোভ না হয় সেই ভেদবুদ্ধির শিকড়কে একটানে সমূলে উৎপাটিত কর্‌তে। কিন্তু যে-রস সঞ্চিত হয়েছে শতাব্দী ধরে সে রস যে শুকিয়ে যাবে এক পহরে তা নয়। অতীত কর্ম্মের ফল ভোগ আমাদের কর্‌তেই হবে তা সে বর্ত্তমানের প্রয়োজনের তাড়া যত জরুরীই হোকনা কেন।

যে-অবস্থায় পড়ে' যে-অভিমানে অভিমানী হ'য়ে একদিন আমরা মুসলমানকে অস্পৃশ্য বলে' ভেবেছিলুম আজ আবার ঠিক সেই অবস্থায় পড়ে' সেই অভিমানে অভিমানী হ'য়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানকে অপবিত্র বলে' মেনে নেবার চেষ্টা করছি। ওর ফলে যে কেবল আমাদের জাতীয় মনই শুচিবাইগ্রস্থ হ'য়ে উঠবে তাই নয় এ সম্ভাবনাও থাক্‌বে যে মানুষের বড় প্রয়োজনের পথে ওটা একদিন একটা মস্ত বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে যেটার সম্ভাবনাকে কল্পনাও কর্‌তে পারছি নে জাহাজের মালিক হ'য়ে হয়ত আর একদিন দেখব যে সেইটে আমাদের সবার চাইতে বড় পাপের জন্ম দিয়ে বসে' আছে।

লিখতে লিখতে চিঠিটা বড় হ'য়ে গেল আজ এইখানে খতম্। লেফ্‌টেনান্ট রায়ের সিকিম যাবার কথা ছিল—গেছেন না কি?

না গিয়ে থাক্লে তাঁকে বোলো আমার কুশল—তাঁকে আর ভিন্ন চিঠি এবার লিখলুম না। সভ্য ও conventional জগতে ফিরে অবধি একটু foreign foreign লাগছে। ইতি—

হাবিলদার।

১লা নভেম্বর, ১৯২১।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সতের বছর বয়েসে এবার আপনার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। আপনি এখন আপনার ছেলের ভবিষ্যত শিক্ষার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন—এবং সে সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করেছেন। এ বিষয়টি আপনার কাছে বিশেষ করে উল্লেখ করবার মানে হচ্ছে এই যে বাংলাদেশে ও একটা সাধারণ ব্যাপার মোটেই নয়। এতকাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের পিতারা তাঁদের ছেলেদের বাঁধা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা সড়কের একদিক দিয়ে ঢুকিয়ে আর একদিক দিয়ে বের করে' আনবার মধ্যে আর কোন চিন্তার প্রয়োজন দেখতেন না। ও-ব্যাপারটীর মধ্যে তাঁদের আশার স্বপ্ন এত বড় হয়ে থাকত যে আশঙ্কার লেশ-মাত্র তাতে স্পর্শ করতে পেত না। ছেলেকে কলেজে ঢুকিয়ে হয় Law নয় medicine নয় civil service ঘুরিয়ে আনা—এই বাঁধিগৎ যে আজ আপনি মানছেন না এতে করে মনে হচ্ছে দেশের হাওয়া বদ্‌লেছে। বাংলা দেশের সব পিতারাই যদি আপনার মতো আপন আপন ছেলের শিক্ষা-সম্বন্ধে সচেতন হন ও ভাবতে সুরু করেন তবে আমার বিশ্বাস বিশ বছরে বাঙালী-সমাজের চেহারা বদ্‌লে যাবে। বলা বাহুল্য আপন ছেলের শিক্ষা-সম্বন্ধে আপনার এই সজাগ অবস্থা সমাজ-হিতৈষী মাত্রকেই আনন্দ দেবে। আমি

ভেবে চিন্তেই এখানে সমাজ-হিতৈষীর জায়গায় স্বদেশ-হিতৈষী কথাটা ব্যবহার করি নি। কেননা স্বদেশ কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পলিটিক্সের পালে হাওয়া লাগাই। কিন্তু এই কথাটা আজ আমাদের সদা সর্ব্বদা স্পষ্ট করে মনে রাখতে হবে যে পলিটিক্স শিক্ষার অঙ্গীভূত হলেও শিক্ষা পলিটিক্সের অঙ্গীভূত নয়। কেননা পলিটিক্স মানুষের জীবন-যাত্রার একটা দিক কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারটা মানুষের মনের সব দিক নিয়ে। কাজেই ওটার চাইতে এটা বড়। বিশেষতঃ শিক্ষাই মানুষ গড়ে—আর ধর্ম্মনীতি বলুন সমাজনীতি বলুন রাজনীতি বলুন, সাহিত্য দর্শন আর্ট বিজ্ঞান বলুন গড়ে তোলে এই মানুষ। জাতির যা কিছু সৃষ্টি তা দু'ভাগে পড়ে। তার একভাগে প্রয়োজনের সৃষ্টি আর একভাগে আনন্দের সৃষ্টি। এর দুয়ের পিছনে দরকার ঐ মানুষ। আর ঐ মানুষ গড়বার যন্ত্র ও মন্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। এই শিক্ষাকে পলিটিক্সের চশমার ভিতর দিয়ে দেখলে তা হয় acute নয় obtuse দেখাইবেই। কেননা পলিটিক্সের লোভ নগদ বিদায়ের উপর সুতরাং ওর লাভ সাময়িক। বাঙালী ব্যবসাদারেরা যেমন রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় প্রথম প্রথম প্রচুর লাভ খেয়ে তারপর ফেল মারে, পোলিটিক্যাল বিদ্যাপিঠগুলোরও তেমনি দশা হবারই বেশী সম্ভাবনা। শিক্ষাকে দাঁড় করাতে হবে আত্ম-অনুশীলনীর উপর, পলিটিক্স পরিচর্চ্চার উপরে নয়। এ কথাটা আপনাকে এত করে বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমাদের ১৯০৬ সালের জাতীয়-শিক্ষা পরিষদ কিম্বা

১৯২১ সালের কলিকাতা বিদ্যাপীঠ দুয়েরই জন্ম পলিটিক্সের তাগিদের ভিতর। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ আমরা সফল করে' তুলতে পারি নি—আজকার কলিকাতা বিদ্যাপীঠই যে সফল হবে তেমন আমার মনে হয় না। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখবেন যে কলিকতা বিদ্যাপীঠ সফলও যদি হয় তবেই যে আমাদের শিক্ষা সমস্যাটা নিঃশেষে মুছে যাবে তা নয়। চোখের সাম্‌নেই দেখতে পাচ্ছেন যে-সব দেশে গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের হাতে সে সব দেশেও শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের মাথা ঘামান' থামে নি। আসলে গভর্ণমেণ্টকে পদে পদে জব্দ কর্‌তে হবে বলেই যে আজ আপনার মনে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এ কথা সত্য নয়—অন্তত সত্য হওয়া উচিত নয়। এ কথা বোধ হয় আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে জোর করে বল্‌তে পারি যে যতদিন না এ প্রশ্ন সত্যিকার করে' জাতির নিগূঢ়তম অন্তর থেকে উঠবে ততদিন এর সমাধানও হবার কোন সম্ভাবনা জন্মাবে না। একমাত্র আমাদের অন্তরের সত্যই বাইরের বাধা বিঘ্নকে জয় করতে পার্‌বে—এবং সেই সত্যই কেবল আমাদের সামর্থ্য দান কর্‌তে পারবে।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যে সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত এ-রকম কথা আমি আপনাকে কোন দিনই বলি নি। কিন্তু আমার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে ঐই যে পরের দোষ বের করার আগে নিজের কোন ত্রুটী আছে কি না সেইটে আবিষ্কার করা। কেননা আমার

বিশ্বাস সফলতা অসফলতার প্রধান কারণটা এইখানে। নিজেদের ত্রুটী না ঝেড়ে ফেল্‌লে বাইরের গলদকে আমরা কোনদিনই এড়িয়ে চল্‌তে পার্‌ব না।

আপনি বলেছিলেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা ছেলেদের শিক্ষা দেন না, দেন কতকগুলো নোট গিলিয়ে যাতে করে তারা এগ্‌জামিন পাশ কর্‌তে পারে। কিন্তু ভেবে দেখুন বাঙালী ছেলের অভিভাবকেরা কি ঠিক ঐটেই এতকাল ধরে চেয়ে আসেন নি? তাঁদের দৃষ্টি কি ছেলেদের শিক্ষার চাইতে class promotion এর দিকেই বেশী আবদ্ধ ছিল না? হাজারে ন' শ' নিরানব্বুই জন অভিভাবকের মনের দিকে তাকিয়ে দেখুন দেখতে পাবেন সেখানে ছেলে কটা পাশ দিয়েছে তার হিসেব আর কোন হিসেব নেই। এই যে পাশের হিসেব এ কেন? কেননা আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বিদ্যার আলয় বলে' দেখিনি, দেখেছি সেটাকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলে'। বাংলার কত কত বাপ যে না খেয়ে না পরে' কর্জ্জ করে ছেলের বিএ, এম, এ, পড়ার খরচ যুগিয়েছেন সে কি কেবল ছেলেকে সুশিক্ষিত করবার ঐকান্তিক ও অহেতুক ইচ্ছায়? শিক্ষার প্রতি এ-রকম অহেতুক অনুরাগ আমাদের থাক্‌লে আমাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান বহুপূর্ব্বে হ'য়ে যেত। কিন্তু তাত নয়— বি, এ এম, এ পাশ করাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থো-পার্জ্জনের পন্থা বেশী সুগম করা। আমার ভয় হয়, আজ যে আমরা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়ের উপরে বিরূপ হয়েছি-

সেটা সেখান থেকে শিক্ষা পাচ্ছি না বলে ততটা নয় যতটা সেখান থেকে বি, এ, এম, এ পাশ করে' বেরুলেও আর তেমন অর্থোপার্জ্জনের স্বসার হয় না বলে'। আমার এ-কথা যে সত্যি তার প্রমাণ কি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে কি কলিকাতা বিদ্যাপীঠে গেলেই দেখতে পাবেন। ও দুই অনুষ্ঠানের Technical Bränch ও Medical Line এ যত ছেলে ভর্ত্তি হয়েছে General Line এ তার অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক হয় নি।

একথা আমি কিন্তু বল্‌ছি না যে খাওয়া পরা সম্বন্ধে সবাই দৃষ্টিহীন হবে বা হওয়া সম্ভব। কিন্তু সমগ্র সমাজের দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র খাওয়া পরার উপরেই নিবদ্ধ হয় তবে একদিন যেমন আর্য্যেরা ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে মধ্য আসিয়া থেকে এ দেশে এসেছিলেন তেম্‌নি আবার একদিন আমাদের ঐ ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে খাসিয়াপাহাড়ের দিকে প্রস্থান করতে হবে। আর সেটা নিশ্চয়ই মহা-প্রস্থান বলে' গণ্য করা চলবে না। আদিম মানুষ কি করত জানি নে কিন্তু আজকের মানুষ cannot live by bread alone কথাটা বিলিতি হলেও সত্যি। সত্যাগ্রহের তোড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়া চল্‌বে না।

কিন্তু সে যা হোক্ এই যে আমাদের অভিভাবকমণ্ডলীর চাওয়া যে তাঁদের ছেলেরা যত শীঘ্র সম্ভব ডিপ্লোমা নিয়ে Law হোক্ Medicine হোক্ প্রফেসরী হোক্ যে কোন পথে অর্থোপার্জ্জনে লেগে যাক্, আপনি কি জোর করে বল্‌তে পারেন যে এই চাওয়া বাংলা দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপরে কোনই

প্রভাব বিস্তার করে নি? আপনি কি জোর করে বল্‌তে পারেন যে এই চাওয়ার তাগিদ্‌ তাঁদের শিক্ষকতা ও অধ্যাপনাকে তদনুরূপ একটা বিশেষ ভঙ্গি ও গতি দেবার এতটুকুমাত্র সাহায্য করে নি? আমরা মনে চিন্তা করেছি এক আর আজ মুখে ফল চাচ্ছি আর এক। মনের কথার চাইতে মুখের কথা বড় মানুষের আইন আদালতের কারখানায় হ'তে পারে কিন্তু সৃষ্টির মন্দিরে নয় এবং তা কোনদিন হবারও সম্ভাবনাটুকু পর্য্যন্ত নেই।

আসলে আপনাদের School of Thoughts এর সঙ্গে আমাদের School of Thoughts এর তর্ক ঠিক এইখানটায়। আমরা বল্‌ছি ও চিরকাল বল্‌ব যে যা আমরা মনে সত্যি করে' চাই নি ও ভাবিনি তা বাইরে সফল করে' তুল্‌বার আশা করা অন্যায়। এবং আশা কর্‌লেই তা সফল হবে না। মনে যে কোন চিন্তা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটার বস্তুবিশ্বে রূপ দেবার শক্তি সংগৃহীত হয়ে যেত যদি তবে সেটা মানুষের পক্ষে বর হত না অভিশাপ হত তা বলা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান সৃষ্টির সত্যটা এই যে সে শক্তি সংগৃহীত হয় না। আপনারা মনকে অস্বীকার না করলেও বাইরের উপরে বেশী ঝোঁক দেন আমরা বাহিরকে লোপ করতে চাইনে কিন্তু মনের চিন্তার মনের ইচ্ছার এমন একটা ভিত্তি গড়ে' তুলতে চাই যা হিমাদ্রির মতো হবে অটল অচল এবং সিন্ধুর মতো হবে সদা জাগ্রত তবেই তা আপনাকে সফল করে' তুলতে পারবে সকল বাধা সকল বিঘ্ন

অতিক্রম করে'—তবেই তা বাইরের প্রতিকূল শক্তিকে বিধ্বস্ত করে' জয়লাভ করতে পারবে।

মানুষের এই যে চিন্তার ও ইচ্ছার শক্তি তা লাভ হ'তে পারে মনকে বিক্ষিপ্ত করে নয়, মনকে সংহত ক'রে। বাঙালীর মন এমনিই তরল অর্থাৎ flexible সে-মন সহসা জমাট বাঁধে না। এটা যেমন একদিকে গুণের তেমনি আর একদিকে দোষের। গুণের এই দিক থেকে যে এমন মনে গোঁড়ামি বলে' পদার্থ টা সহসা কায়েমী হ'তে পারে না। এমন মনের বিশ্ব-মনের সঙ্গে সংযোগ ও সম্বন্ধ সহজে স্থাপিত হ'য়ে যায়। এটা জাতির পক্ষে একটা মহা লাভ। এতে করে' জাতি তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে' আপনাকে একটা বৃহত্তর জগতে অনুভব করতে পারে। আর এটা আপনি নিশ্চয়ই মানেন যে সংকীর্ণতারই আর এক নাম মৃত্যু। জাতীয় বৈশিষ্ট্যই বলুন আর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যই বলুন তা বাঁচিয়ে রাখবার অর্থাৎ তার জীবনীশক্তি রক্ষা করবার সহজ ও একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্ব-মনের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষা করে' করে' চলা। বাঙালী মনের ঐ flexibilityর জন্যে বাঙালী পরের মনের জিনিস সহজে গ্রহণ করতে হজম করতে পারে। ঐ কারণে পাশ্চাত্যের সাহিত্য আমাদের মনকে যেমন সত্যিকার দোলা দিয়েছে যেমন সত্যিকার করে' অনুপ্রাণিত করেছে ভারতের আর কোন প্রদেশবাসীর তেমন করে নি। অথচ বাঙালী যে সবাই ইয়োরোপীয়ান বনে' যায় নি তা ত চোখেই

দেখা যায়।॰ যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমরা অনেকে বৈদেশিক সাহিত্য বলি, আমরা ভুলে যাই যে সেই রবীন্দ্রনাথের গানে গল্পে কবিতায় বাঙালী-মনের রূপ ও ছবি যেমন করে" আছে তেমন কিন্তু আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে নেই।

লয়ে রসারসি করি কশাকশি
পোঁটলা পুঁটলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
গৃহিণী কহিল কাঁদি'
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে লয়ে
কষ্ট অনেক হবে"

কিম্বা—

আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে
মাথা খাও ভুলিও না খেয়ো মনে করে'।

কিম্বা—

কহিলাম ধীরে
"তবে আসি।" অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

এ যে ফারসীও নয় ফরাসীও নয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপর—

গ্রামপথ হতে প্রভাত আলোতে
উড়িছে গোখুর ধূলি
উছলিত ঘট বেড়ি কটি তট
চলিয়াছে বধূগুলি
তোমার কাঁকন বাজে ঘন ঘন—

*   *   *

দুইদিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে—

এ যে বাংলারই ছবি এ সম্বন্ধেও নিশ্চয় কারো ভুল করবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ রকম রাশি রাশি তোলা যায়।

তবে রবীন্দ্রনাথে ওর অতিরিক্ত একটা জিনিস আছে যা আসলে প্রাচ্যেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়—অথচ যে দখলি-স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে তারই। এই জিনিসটী হচ্ছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের প্রতিদিনকার কর্ম্ম চিন্তা আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে' যে একটা চিদাকাশই বলুন বা হৃদাকাশই বলুন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়কেই আলিঙ্গন করে' আছে সেই আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলা ও কাব্যে সেইখানকার সুর ছবি ও রস জাগিয়ে তোলা। বলা বাহুল্য সে-সুর সে-রস সে-ছবিতে মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কোনই সুবিধা হয় না কিন্তু তাতে মানুষের মধ্যেকার এমন একটা জিনিসের রসদ

থাকে যে জিনিসটা শুকিয়ে গেলে মানুষ Eat and Drink and be damn'd অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনার স্ত্রীকে সেদিন "যেতে নাহি দিব" কবিতাটা পড়ে শোনাচ্ছিলুম। সামান্য কিন্তু অতি সকরুণ বাঙালী পরিবারের একটা ঘটনা। পিতা বিদেশে চলেছেন। পোঁটলা পুঁটলি বাক্স তোরঙ্গ সব সাজিয়ে গুছিয়ে বেরুবার সময় তিনি তাঁর চার বছরের মেয়ের কাছে বিদায় নেবেন—মেয়ে হঠাৎ বলে বসল—"যেতে আমি দিব না তোমায়"।

যেখানে আছিল বসি' রহিল সেথায়
ধরিল না বাহু মোর রুধিল না দ্বার
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়।"

কিন্তু—

তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

এ অতি সকরুণ! গভীর একটা ব্যথা প্রাণ বিদ্ধ করে' যায়। কিন্তু ঐ ব্যথাই আর কেবল ব্যথা থাকে না যখন দেখি যে কবির দৃষ্টিতে এইটে ধরা পড়েছে যে বাঙালী পরিবারের ঐ ঘটনাটা চার বছর বয়েসের একটা বাঙালী শিশুর ঐ অশ্রু-সজল অধিকার-প্রকাশ এ বিশ্বে একটা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়। বিশ্ব-সুরের সঙ্গে ওর সুর বাঁধা। বিশ্ব-সুরেরই ও একটা প্রতিধ্বনি একটা বাঙালী শিশু-কণ্ঠে ফুটে উঠেছে।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব"

কবি দেখ্‌তে পেলেন—

তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব' নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব নারে।"

এ ক্রন্দন-ধ্বনি সারা' বিশ্ব হতে কবি-কর্ণে ধ্বনিত হ'ল

প্রলয় সমুদ্র-বাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্র বাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে' তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।

যেন

উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্ম্ম-ভেদি করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে।

এই যে ব্যথা এ ব্যথা যতক্ষণ একটী বাঙালী পরিবারের পারিবারিক মনে আবদ্ধ ছিল ততক্ষণ তা একান্তভাবে ব্যথা-

রূপেই ছিল। কিন্তু সেই ব্যথা সেই ক্রন্দন যখন বিশ্বপটকে perspective করে দেখলুম শুনলুম তখন এই ব্যথার মধ্যে যে-একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ রয়েছে সেইটের সন্ধান সেইটের অনুভব পেলুম। সংকীর্ণতা যেখানে ব্যথারূপেই আপনাকে সমাপ্ত মনে করেছিল সেখানে নিখিলের স্পর্শ জানিয়ে দিয়ে গেল যে সমাপ্তি ঐ ব্যথায় নয় ব্যথার পিছনে যে আনন্দ আছে সেই আনন্দে। যেখানে স্বার্থদুষ্ট অহঙ্কার গণ্ডী কেবল বেদনাকেই জমা করে' তুল্‌ছিল অখণ্ডের সংবাদ সেখানে পুলক-স্পর্শ ছুঁইয়ে গেল।

এখন কি বল্‌তে হবে এ-কবিতাটীর অর্দ্ধেক বঙ্গ আর অর্দ্ধেক ফৈরঙ্গ? এই যে সামান্য থেকে অসামান্যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে বিশেষ থেকে বিশ্বে চলমান কবির দৃষ্টি এ কি বিশেষ করে' পাশ্চাত্য? তা যদি হয় তবে বল্‌ব যে ঐ পাশ্চাত্যকে স্বীকার করে' আমরা বেঁচে গেছি—এবং আমাদের সাহিত্য new lease of life পেয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিশ্বের সঙ্গে কোলাকুলি করাটা প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যেরই হোক্ কারও একচেটে নয়।

কিন্তু বলছিলুম বাঙালী মনের flexibility-র কথা। সে-মনের গুণের কথাই আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ঐ রকম মনের একটা প্রকাণ্ড দোষ আছে। সে দোষটা হচ্ছে এই যে এমন মনকে সহজে জমাট করা যায় না। এমন মনকে সংহত করে' কেন্দ্রীভূত করে' তার সমস্ত শক্তিকে একটা অপ্রতিহত

সামর্থ্যের সঙ্গে কোন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপারের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। এই খানেই বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা। এই কারণেই বাঙালী চরিত্রে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অধ্যবসায় প্রভৃতির তেমন সদ্ভাব নেই। যার জোরে মানুষ বলে—যা ধর্‌ব তা কর্‌ব—একটা doggedness একটা tenacity of purpose বাঙালী চরিত্রে এর বাহুল্য নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। কিন্তু ঐটা না হ'লে মনোজগতে যাই হোক্ কর্ম্মজগতে জীবন-যাত্রার যুদ্ধে বিশ্বের সংগ্রাম-পথে বাঙালীকে পিছিয়ে পড়ে' থাক্‌তেই হবে। বাঙালার সহরে সহরে মাড়োয়ারী গুজরাটীর হর্ম্ম্যাবলী উঠবেই—বাঙালার পল্লীতে পল্লীতে ভোজপুরী গাজীপুরী জুটবেই। আপনি হয়ত বলবেন যে আমি provincial patriotism প্রচার করছি। কিন্তু আপনাদের কাছেই ত শুনি যে National না হ'লে Intenational চল্‌বে না। সুতরাং ঐ সূত্র অনুসারেই Provincial না হ'লে Interprovincial চল্‌বে না। আমরা বাঙালীরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে অবাঙালীদের কাছে mortgage কর্‌তে চাই নে।

সুতরাং বাঙালীর এই তরল মনকে মৃত্যুর মতো rigid না করে' একটা stability দান করতে হবে। তার উপায় কি? তার উপায় যাই হোক্ সেটা নিশ্চয়ই কেবল political agitation নয়। কেননা agitation মাত্রেই মনকে কেবল সংহত করে না তাই নয় তা মনকে সংক্ষুব্ধ করে। আর

মন সংক্ষুব্ধ হবার অর্থ মন কেন্দ্রচ্যুত হওয়া। মনকে কেন্দ্রচ্যুত করে' তাকে কেন্দ্রীভূত করা নিশ্চয়ই লজিকের বাইরে।

আসলে আমাদের political agitation এ দেশের political constitution এর যে রদ বদল হয় হোক্ কিন্তু মানুষের মন গঠন চরিত্র গঠনের জন্য একটা অন্তরের সাধনা চাই। আর এ সাধনা সমষ্টিগত হতে পারে না, এ সাধনা হচ্ছে ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত এই সাধনায় সিদ্ধ না হ'লে আমাদের জাতীয় সব কিছুই লব্ধ হলেও অসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

যাক্ সে সব কথা। আপনি যখন আপনার ছেলের শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবছেন তখন সেই সম্বন্ধে আমার মতামত দু' এক কথা বল্‌ছি।

আমার একটা আদর্শ শিক্ষার আদর্শ আছে। সেটা বল্‌ছি।

আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিশ্চয় আপনি টের পেয়েছেন যে আমি একজন ঘোরতর individualist। এতে মনে করবেন না যে আমি সমাজ মানি নে। সমাজ আমি নিশ্চয় মানি কিন্তু আমি বল্‌তে চাই এই কথা যে সমাজও যে সম্ভব হয়েছে তা ব্যক্তিরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মের গুণে—সমাজের অস্তিত্ব সমাজের প্রতিষ্ঠা ব্যষ্টিরই fulfilment এর উপর। যে সমাজ ব্যষ্টির সার্থক হবার পথে বাধাই সৃষ্টি করে' করে' চলে সে-সমাজের বন্ধন-গ্রন্থি ছিঁড়বেই। আগে ব্যষ্টি তারপর সমষ্টি—আগে unit তারপর unity—ব্যষ্টি যে সামাজিক আইন-কানুনে বাঁধা দেয় সেই আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে ব্যষ্টিরই সত্য-সমষ্টির সার্থকতা হয়

বসে'। তাই দেখতে পাই ব্যক্তির অন্তর-সত্যের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যের তাগিদে সামাজিক গ্রন্থিগুলিও কখনও ভাঙে কখনও ঝায়ে সরছে—কোনটা একটু আলগা হচ্ছে—কোনটা আরও কসে' যাচ্ছে—আবার কোন কোনটা হয়ত একেবারেই খুলে পড়ছে।

আমার মনে যে আদর্শ শিক্ষার আদর্শ আছে সেটাও একেবারে individualistic. একটী শিক্ষকের কাছে পঞ্চাশটী ছেলে পড়ুক—যদি শিক্ষকের পড়াবার যোগ্যতা থাকে—কিন্তু তা একই সুরে এক সূত্র নয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সার্থক করে' তোলা। আপনি নিশ্চয় বলবেন যে কথাটা শুন্‌তে বেশ কিন্তু ওর কোন মানে হয় না—কেননা ওর বিশেষ একটা অর্থ নেই—অর্থাৎ কথাটা vague. কথাটা ঠিক সুতরাং ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

আমি এই কথাটা বিশ্বাস করি যে সুস্থ সবল ও প্রাণবান মানুষের মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ আছে, কোন না কোন বিষয়ে তার একটা সহজ প্রেরণা একটা সহজ কুশলতা আছে। প্রত্যেক মানুষটাই এক একটা genius. বুঝতেই পারছেন genius কথাটা আমি এখানে ব্যবহার করছি in its broadest sense possible. এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের তার ঐ সহজ প্রেরণা সহজ কুশলতার দিকে সচেতন হয়ে ওঠা—অর্থাৎ দু' কথায়—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে আত্ম-জ্ঞান এই আত্ম-জ্ঞানের ফলে আত্মার স্বধর্ম্মের

পরিচয় পেয়ে মানুষ সেই অনুসারে আপনার জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে আপনার জীবনে তেম্‌নি কর্ম্ম তেম্‌নি ধর্ম্ম বরণ করে' নেবে। একেই আমি আদর্শ শিক্ষা বলি কেননা এতেই মানুষের জীবন সত্যিকার করে' সার্থক হবে সুতরাং আনন্দময় হবে।

এইখানে যে প্রশ্নটী উঠবে তা জানি। প্রশ্নটি উঠবে এই যে মানুষের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে সে যা তাকেই ফুটিয়ে ধরা তাকেই সার্থক করে' তোলা তবে Human progress, World's evolution কথাগুলো কোথায় যায়? শিক্ষার উদ্দেশ্য আসলে আপনাকে অতিক্রম করা নয় কি?

কিন্তু Human progress, world's Evolution কি মানুষের যুগে যুগে নিজেকে অতিক্রম করার ফল? এ অতিক্রম করার মানে কি? এর মানে যদি এই হয় যে মানুষ এক অবস্থা থেকে আজগুবি ভাবে আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে ম্যাজিকের দ্বারা তবে আমি বল্‌ব যে মানুষ কোন কালেই আপনাকে অতিক্রম করে নি এবং কোনকালে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বেও না। আর অতিক্রম করার অর্থ যদি এই হয় যে মানুষ তার আপনার মধ্যেই যে সম্ভাবনার বীজ রয়েছে সেই সম্ভাবনারই চরম অভিব্যক্তির দিকে আপনাকে টেনে টেনে চলেছে তাহলে বল্‌ব যে মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাকে অতিক্রম কর্‌ছে। আসলে মানুষ তার সত্তার প্রসার করেছে আপনাকে অতিক্রম করে' নয়,

আপনাকে পরিক্রমণ করে'। বানর আপনাকে অতিক্রম করে' মানুষ হয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে সুতরাং আমার বিশ্বাস ও missing link কোন দিনই পাওয়া যাবে না। আর মানুষ যদি কোন দিন দেবতা হয় তবে তার মানেই এই যে মানুষের মধ্যেই দেবতা হবার সম্ভাবনার বীজ গুপ্ত ছিল।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন Human progress এর অর্থ মানুষের গুণ সমষ্টির বিকাশ ও প্রসার এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় লম্ফ প্রদান নয়। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের আপন আপন গুণ ও ধর্ম্মের সুসার ও প্রসার। কেননা আমি আগেই বলেছি আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সুস্থ ও বল ও প্রাণবান মানুষের মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ আছে যা তার সহজ ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষের এই গুণের স্বাতন্ত্র্য এম্‌নি, প্রত্যেকের চিন্তাশক্তি মননশক্তি ধারণশক্তি এম্‌নি আলাদা যে তাদের কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে চলবার তাল আলাদা হতে বাধ্য। এই কারণেই আমার আদর্শ শিক্ষার আদর্শটা একেবারে individualistic.

কিন্তু আমার এ আদর্শ আজ প্রকাশ করা বা প্রচার করা অনর্থক। কেননা আজ সভ্যজগতের সকল অনুষ্ঠান এমনি যন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছে সমাজ নিজেকে এমনি mechanise করে' ফেলেছে যে এমন কি শিক্ষায়ও আমরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবতে পারিনে। আমার আশঙ্কা হয় কিছুদিন পরে

আমাদের শিক্ষালয়গুলোর ক্লাশে ক্লাশে শিক্ষকের পরিবর্ত্তে গ্রামোফনের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়া সুরু হবে—আর তাই থেকে ছেলেরা নোট নেবে।

এইখানেই চিঠি শেষ করতে হল। এই বার পৃষ্ঠা চিঠি পড়ে দেখতে পাবেন যে আপনি যে-কথাটী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অর্থাৎ আপনার ছেলের ভবিষ্যতে শিক্ষার সম্বন্ধে পরামর্শ সেই কথারই উত্তর দেওয়া হয় নি। কেননা সেরকম পরামর্শ দেবার আমি উপযুক্ত এ কথা মনে করতেই আমার মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ইতি—

আপনাদের কয়েকদিনের—
অতিথি।